# বাঙ্গালী কোন পথে ?



শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

সাহিত্যভূষণ।

মূল্য ১।০ টাকা।

প্রকাশক —
শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
৫ ডাফ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশকের নিকট
এবং
কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ভেনাস প্রেসে
শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# ভূমিকা

স্কুলে পড়িবার সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন—'গার্হস্থ্য জীবনে যে সকল বৃত্তি ও অবস্থার অধীন হইতে হয়, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে সে গুলির সহিত নিজেকে যথাসম্ভব খাপ খাওয়ানর চেষ্টা করা উচিত।' তাঁহার এই মূল্যবান উপদেশ আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। গৃহে পরমারাধ্য পিতা অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক বহু মূল্যবান উপদেশ দিতেন। অতএব সেই সময় হইতে সমাজকে ব্যাপকভাবে দেখিতে শিখিয়াছিলাম। তাঁহাদের সুশিক্ষার প্রভাবে আমার অন্তরে যে চিন্তার উন্মেষ হইয়াছিল, কয়েক বৎসর ব্যাপী বহু ঝঞ্ঝার মধ্যেও তাহা বিধ্বস্ত হয় নাই বরং পারিপার্শ্বিকের ঘাত প্রতিঘাতে অধিকতর প্রসারিত হইয়াছে। সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা যায় যে আধুনিক সভ্য জগৎ সর্ব্বক্ষণ নীরব ভাষায় বলিতেছে—'ফেল কড়ি মাখ তেল'। সেই কড়ির সন্ধানই এই পুস্তকের মূল ভিত্তি। এইরূপ মনে হয় যে, উহার মধ্যেই বাঙ্গালী জীবনের বৈশিষ্ট প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান।

প্রুফ্ দেখার দোষে স্থানে স্থানে অশুদ্ধি রহিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বীনাপাণি পর্দ্দা গার্লস স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটারী কলিকাতা ৫ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট নিবাসী ভক্তিভাজন ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে আমাকে উৎসাহিত এবং সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা ৪৪ নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু মহাশয় কয়েকটী বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ১৩৪৩। } গ্রন্থকার

# উৎসর্গ

পরমারাধ্য
পিতার স্বর্গীয় আত্মার
উদ্দেশে

—০—

# সূচীপত্র

## প্রথম খণ্ড

## দ্বিতীয় খণ্ড



## পরিশিষ্ট

# মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের সাধারণ অধিবাসীদিগের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পী, ব্যবসায়ী, মজুর এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রভৃতি কাহারও অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। তাহারা বেশ পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যেই বাস করিত। এখনকার মত শত অভাব-অভিযোগ কোন দিনই সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। হয়ত দৈব দুর্ব্বিপাকে কোন কোন সময় সাময়িক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু, তাই বলিয়া দারিদ্র্য, অভাব-অনটন এবং তৎ সংক্রান্ত অশান্তি এখনকার মত বদ্ধমূল ছিল না। আমাদের সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাঙ্গালা-মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তখন অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। তাহাতেও তখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিঃশেষ হইত না। এখনও বহু অ-বাঙ্গালী বাঙ্গালা মায়ের চিরসবুজ আঁচলখানির আশ্রয়ে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বাস করিতেছে। কিন্তু যাহারা উক্ত আঁচলখানিতে সবুজ রংএর তুলি বুলাইয়া উহাকে নয়নরঞ্জন করে তাহাদের ঘরে আজ অন্ন নাই—বাঙ্গালী কৃষককুল লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও আজ

অন্নহীন। বাঙ্গালার প্রায় চারিদিকে দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব লীলা দৃষ্টিগোচর হয়। বৎসরের পর বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মাঠে মাঠে নানাবিধ ফসল তাহারা উৎপন্ন করিতেছে অথচ উক্ত ফসল-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে নিজ নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, পেটের ভাত এবং পরণের কাপড়ও সচ্ছল রূপে তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে না। মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে!

অভাবের চাপে পড়িয়া উক্ত কৃষককুল মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে পৈতৃক ভিটা মাটীটুকুও ঘুচাইয়া কোনরূপে দিনপাত করিতে থাকে। অন্ন বস্ত্রের অভাব পূরণ ত হয়ই না,—তাহার উপর রোগাক্রান্ত হইলে, এক বড়ি ঔষধ এবং একটু পথ্যের অভাবেও অনেক হতভাগ্যের শেষ নিঃস্বাস বাতাসে মিলাইয়া যায়। তাহাদের পশ্চাতে আরও ভয়াবহ একটী চিত্র পড়িয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার নিত্যই আমাদের নয়নগোচর হয়। কিন্তু ঐ সকল ব্যাপার সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। কেহ হয়ত ঐ বিষয়ে একটু আধটু চিন্তা করেন, পরন্তু বহু লোক ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। উহাদের জীবন্ত দুর্দ্দশাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকার করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত মহাপ্রাণ দেবতুল্য লোক বোধ হয় এক লক্ষের মধ্যে এক জন আছেন

কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। ঐরূপ ঔদাসীন্য আমাদের মনুষ্য নামের প্রধান কলঙ্ক।

উল্লিখিত অবস্থার মধ্য দিয়া দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া বাঙ্গালার কৃষককুল ধীরে ধীরে জীবন পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক, আর পরোক্ষ ভাবেই হোক, তাহাদের দুর্দ্দশা আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে। তাই আজ সকলেই, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা, অল্প বিস্তর তাহাদের দুঃখের অংশীদার হইয়াছে।

আধুনিক বাঙ্গালীর সমষ্টিগত অবস্থার দিকে তাকাইলে, দিন দিন বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার কিরূপ ভয়াবহ অধঃপতন হইতেছে তাহা বেশ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থেরা, যাঁহারা পল্লীর কৃষকদিগের অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই দারিদ্র্য-জালে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্ব প্রকার অশান্তির মধ্যে দিন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদের আর্থিক অসচ্ছলতা কোন দিন ঘুচে না; ঋণ ভারে তাঁহাদের দেহমন সর্ব্বদা আক্রান্ত; পারিবারিক সুখ-শান্তি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যেন তাঁহাদের গৃহ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে। মনে উচ্চাকাঙ্খা থাকিলেও অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহারা কোনরূপেই সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। মনের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি অর্থকৃচ্ছ্রতার দারুণ উত্তাপে শুষ্ক ও নির্ম্মূল হইতে

বসিয়াছে। তাহা ছাড়া ঐরূপ অবস্থায় যখন মাতৃপিতৃদায়, কন্যাদায়, পুত্র কন্যাদের শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি বোঝাগুলি একে একে তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে তখন তাঁহাদের যেন শ্বাসরোধ ঘটিবার উপক্রম হয়। পুরুষানুক্রমে যে অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ সে অবস্থার আমূল সংস্কার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অথচ সেই গতানুগতিক চাল-চলনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনমুখী আধুনিক অবস্থার সামঞ্জস্য বজায় করা অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব-পর নহে। ফলতঃ তাঁহারা যৎপরনাস্তি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছেন। উক্ত অবস্থা-নিষ্পীড়িত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বেদনাক্লিষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে কবির কথায় বলিতে হয়—

জীবন এমন ভ্রম কে আগে জানিত রে
হ'য়ে তবে লালায়িত কে ইহা যাচিত রে ॥

এইরূপ অবস্থায় একমাত্র জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের এই যে একচেটিয়া অভাব-অভিযোগ, দারিদ্র্য এবং তৎপ্রসূত অশান্তি, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই, তাঁহাদিগকে কি ঐরূপ ভাবে তিল তিল করিয়া মরিতে হইবে ?

ইহার পর আমাদের দেশের তথা কথিত কতকগুলি ধনী লোকের অবস্থা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরুষানুক্রমে

'বোল বোলাও' বজায় রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন এমন অনেক বনিয়াদী গৃহস্থ, বাহ্য আড়ম্বর থাকা সত্ত্বেও, ক্রমশঃ অন্তঃসারশূণ্য ও অশান্তিজর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছেন। শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা কিছুতেই কালোচিত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধাপ ফেলিতে সমর্থ হইতেছেন না। পূর্ব্বের মামুলী অভিমান-সূত্র কেমন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, অপনা হইতেই উহা যেন কেমন অর্থহীন হইতেছে। যাঁহারা এক সময় জন সাধারণের কল্যান সাধন করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন, যাঁহাদের স্বদেশহিতৈষিণার পরিচায়ক বিবিধ জীবন্ত অনুষ্ঠান এখনও কোন রকমে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, যাঁহাদের মনুষত্বধর্ম্ম জ্ঞাপক কার্য্যাবলী এখনও প্রবাদের ন্যায় শ্রুত হইয়া থাকে সেই মহৎহৃদয় জমিদারদিগের উত্তরাধিকারিদের অনেকেই স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সম্পুর্ণ সমর্থ হইতেছেন না। যাঁহারা এক সময় গরীবের মা বাপ ছিলেন, যাঁহাদের মুখ চাহিয়া গরীবের ভরসা বৃদ্ধি পাইত, তাঁহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দেশের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থা যে যথেষ্ট নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ক্ষেত্র ইহা নহে। তাহা হইলেও মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠে—তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন কি হইতে পারে না? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল জনমণ্ডলীর অবস্থা আরও কত শোচনীয় হইবে! যে কৃষক কুল জমিদার

পোষক এবং জমিদার যাহাদের রক্ষক তাহাদের অবস্থাই বা কিরূপ হইবে ! ইহার প্রতিকারেচ্ছু কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন, উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই আবার অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ।

আজ যে আর্থিক দুর্দ্দশা রূপ মহাদৈত্য বাঙ্গালীর আনাচে কানাচে ঘুরিতেছে এবং অবসর পাইলেই প্রাঙ্গন অধিকার করিয়া বসিতেছে তাহা আর গোপন করিবার বিষয় নহে, উহা প্রকটিত সত্য। বাঙ্গালা দেশে মধ্য-শ্রেণীর ভিতর মুষ্টিমেয় পরিবারই দেখা যায় যেখানে সুখশান্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। যাঁহারা উচ্চ বেতনে চাকুরী করেন, যাঁহাদের চল্‌তি কারবার আছে অথবা যাঁহাদের পৈতৃক অর্থ আছে, এইরূপ কতকগুলি গৃহস্থ এখনও অনেক বিষয়ে সুখ-শান্তিতে আছেন। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির দিক দিয়া ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে ঐরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, এমন কি, নগণ্যও বলা যাইতে পারে। মোট কথা, বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার না হইলে জাতির ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। অতএব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কবিকথিত "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' এই মহামন্ত্রের অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

'সোণার বাঙ্গালা' কথাটীর সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে কারণ, দেশ বিদেশের লোক বাঙ্গালার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে। তবু বাঙ্গালী কাঙ্গাল। এই অসামঞ্জস্যের একমাত্র কারণ এই মনে হয় যে, বাঙ্গালীর ছেলেরা ভাবরাজ্যে যত অধিক বিচরণ করে বাস্তব জগতের খুঁটি নাটি লইয়া তত মাথা ঘামায় না—মনের খাদ্য শূণ্যে থাকিলেও দেহের খাদ্য যে ধরাপৃষ্ঠে, তাহার সে কথা আমলে আনিতে চাহে না। বাঙ্গালীর ছেলের জন্য বিস্তীর্ণ কর্ম্ম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে একথা সত্য। একটু নিবিষ্ট ভাবে অনুধাবন করিলেই তাহারা কর্ম্ম জীবনের যথাযোগ্য ধারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। অন্যান্য জিনিষের ন্যায় অর্থের সন্ধান করিলে অর্থও মিলে। ফলতঃ তখন উন্নতির পথও সুগম হয়।

অনেকের এরূপ ধারণা আছে, অর্থোপার্জ্জনের উপরই প্রকৃত আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে। স্থুলতঃ দেখিতে গেলে বিষয়টী ঐরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অর্থব্যয়ের উপরও আর্থিক উন্নতি অবনতি যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকে। যাঁহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন অথবা যাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ থাকে এমন লোকদিগের মধ্যে ও কেহ কেহ, সময় সময়, অর্থাভাবগ্রস্ত হন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং প্রত্যেক লোকেরই যে অর্থের সদ্ব্যয়-প্রণালী শিক্ষা করা এবং অনুশীলন করা উচিত তাহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

অপব্যয়ের দ্বারা আমাদের জাতীয় অর্থের কতক পরিমাণ

নষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলে হয়ত দুঃর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট বহু বাঙ্গালীর জীবন রক্ষার উপায় হইতে পারে।

পুস্তকাভ্যন্তরস্থ বিষয়গুলির মৌলিক অংশের ( theoratical side ) উপর বেশী জোর ( stress ) না দিয়া ব্যবহারিক অংশের ( practical side ) উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, কার্য্যতঃ লোকের উপকার হউক। কিন্তু আলোচ্য বিষয়গুলির স্থুল তত্ব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিচার করিতে গেলে, মূল বিষয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া কঠিন হয়। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ দেখা যায় যে সূক্ষ্ম বিষয়গুলি কাজে পরিণত করা বিশেষ অসুবিধা জনক। কর্ম্মধারার উপর লক্ষ্য না রাখিয়া মৌলিক তথ্যের উপর লক্ষ্য রাখিলে কার্য্য সিদ্ধির পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়; জল্পনা কল্পনা মনেই থাকিয়া যায়। কয়েক জন বন্ধুর সহিত কোন কোন বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাঁহারা সূক্ষ্ম তত্ত্বের মধ্যে এইরূপ নিমজ্জিত হন যে, সহজে তাঁহাদিগকে স্থুল বিষয়ে ফিরাইয়া আনা যায় না। কেহ কেহ দুই দিকই রক্ষা করিতে চান। কিন্তু একসঙ্গে "ডুড্ এবং টামাক' খাইতে গেলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাঁহাদের ও সেইরূপ অবস্থা হয়। একটু খোলসা করিয়া বলা যাক— তাঁহারা স্বীকার করেন যে, কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার ব্যতীত বাঙ্গালী জাতির শ্রীবৃদ্ধির কোন উপায় নাই। অথচ এই

বৈজ্ঞানিক যুগের বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা গুলি উঠিয়া যাক্ সেরূপ চিন্তা করিতেও তাঁহাদের দুঃখ এবং আশঙ্কা উপস্থিত হয়। মোটের উপর, তাঁহারা 'শ্যাম ও কুল' উভয়ই রক্ষা করিতে গিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। ফলতঃ তাঁহাদিগকে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে অবস্থান করিতে হয়।

পুস্তকাভ্যন্তরে অবতারিত বিষয়গুলি খুব নূতন নহে। অতএব সে গুলির বিশেষত্ব এবং সন্নিবেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক। অর্থোপার্জ্জনের আশু প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকেরই কি করি, কোন পথ ধরি' ইত্যাদি বিষয় মনে উদিত হয়। এবং পথ-নির্দ্দেশ পাইবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্থান কাল ও পাত্র ভেদে চিন্তার ধারা ও দিক্ পরিবর্ত্তিত হয়। কেহ দৃশ্যত মন্দ পথে যাইয়াও উন্নতি লাভ করে, পরন্তু অপর লোকে সৎপথে থাকিয়াও দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারে না। অবশ্য দুই একটী অসমঞ্জ দৃষ্টান্ত হইতে কিছু সিদ্ধান্ত করা অসবন্ত। অতএব কর্ম্মপথ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ব্যাপক ভাবে বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম-জীবনে অগ্রসর হইতে হয়।

উন্নতিকামী ব্যক্তিরা সময় মত ভাল suggestion (নির্দ্দেশ) পাইলে বহু ক্ষেত্রে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়া থাকে। ইহা কার্য্যকারণ সম্বন্ধীয় নীতি। কোন প্রকৃষ্ট কারণ না

থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। আবার কারণের তাৎপর্য্যানুসারে কার্য্যেরও প্রকারভেদ হয়। সেই জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভাল পরামর্শের প্রয়োজন। উক্ত উদ্দেশ্য লইয়া সহজ অথচ সরল বিষয়গুলি পুস্তকাভ্যন্তরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

মুষ্টিমেয় লোকের জন্য এই বই লিখিত হয় নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, সহরবাসী পল্লীবাসী, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নির্ব্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্য এই বই রচিত হইরাছে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আর্থিক কল্যাণ হউক ইহাই গ্রন্থকারের একমাত্র কাম্য বিষয়। যদি এই পুস্তকের নির্দ্দেশ দ্বারা একজন বাঙ্গালীরও কল্যাণ সাধিত হয় তাহা হইলে গ্রন্থকারের সমস্ত শ্রম সফল হইবে।

---

# বাঙ্গালী কোন পথে

## প্রথম খণ্ড

## অর্থ কি

অর্থের সংজ্ঞা লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে স্থূলতঃ দেখিতে গেলে, কৃষিজাত, শিল্পজাত ও খনিজ দ্রব্যের এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন করা যায় তাহারই নাম অর্থ। আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, এই বলিতে হয় যে, কোন কিছুর পরিবর্ত্তে যে মুদ্রা পাওয়া যায় তাহাই অর্থ। প্রত্যেক সভ্য দেশে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারা অর্থের মান নির্ণয় করা হয়। মোট কথা, অর্থ বলিলে কি বুঝায় তাহা আমরা প্রত্যেকেই জানি।

ব্যক্তিগত ভাবে যেমন অর্থের পরিমাণের তারতম্য হয় সেইরূপ জাতিরও মোট অর্থের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। সমগ্র মানব জাতির অর্থের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। উক্ত অর্থ এক স্থানে স্থায়ী ভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। অর্থ এক হাত হইতে অন্য হাতে প্রতিনিয়তই চলিয়া যাইতেছে। এই প্রকার আদান-প্রদান (tran-

saction ) জগতের সমস্ত সভ্য জাতিগুলিকে কর্ম্মচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্যই অর্থকে কর্ম্মশক্তির স্নায়ু বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অর্থ-প্রবাহ সমস্ত সভ্য জাতিগুলিকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যানুসারে অর্থ-স্রোত প্রখর অথবা মন্দীভূত হইয়া থাকে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় এবং উহার অব্যবহিত পরে সমগ্র জগতের অর্থস্রোত (current of liquid money) অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তখন প্রত্যেক লোকের আয় বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই অনুপাতে লোকের ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সময় সাধারণ লোকও এক টাকার জিনিষ পাঁচ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছে। তখন অর্থের সচ্ছলতা থাকায় টাকার মূল্য একটু হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ঐরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। কেহ কেহ মনে করেন উহার প্রতিক্রিয়া ( reaction ) আরম্ভ হইয়া অর্থস্রোত মন্দীভূত হইয়াছে। তাহার ফলে এখন সমগ্র সভ্য জগতে দারুণ অর্থাভাব বিকট রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্যই যে আদান প্রদান ( transaction ) কমিয়া গিয়াছে—অনেক স্থানে একরূপ বন্ধই হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। অধিকাংশ লোকের আয় শতকরা ৩০৲ টাকা কমিয়া গিয়া থাকিলে

পাওনাদরদিগকে টাকা দিবার সময় শতকরা ৫০৲ টাকারও অধিক কম দেওয়া হইতেছে। আয়ের পরিমাণ যে অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে, যদি দেনা শোধ করিবার সময়ও সেই অনুপাতের দিকে দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে এত মন্দ আর্থিক অবস্থায় মধ্যেও সাধারণ লোকের কোন কোন বিষয়ে কতকটা সুবিধা হইত।

---

## অর্থাগমের বিভিন্ন উপায়

সাধারণতঃ যে যে উপায়ে অর্থোপার্জ্জন হয় সে গুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মোটামুটি ভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিই অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ এই সকল বৃত্তির মধ্যে বাণিজ্য ও কৃষি বৃত্তির দ্বারাই অধিক অর্থাগম হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।

ইহার অর্থ এই যে, বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। কৃষি দ্বারা তাহার প্রায় অৰ্দ্ধেক এবং তাহার অৰ্দ্ধাংশ চাকুরী দ্বারা (অবশ্য ভাল চাকুরী) উপার্জ্জন করা যায়। পরন্তু ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা কোন উন্নতি

হয় না। ভিখারীর ভিক্ষালব্ধ অর্থাদি দ্বারা কোন রূপে দিন গুজরাণ হয় মাত্র, তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়া অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হয় না; কাজে কাজেই তাহার উপর কোন দিনই লক্ষ্মীর স্নেহদৃষ্টি পড়ে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথমোক্ত তিনটী বৃত্তি উন্নতিলাভেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই অবলম্বনের বিষয়। শেষোক্ত বৃত্তিটী ত্যাগীর জন্য, ভোগীর জন্য নহে। ভোগীর পক্ষে ভিক্ষা বৃত্তি অত্যন্ত হেয় এবং অবজ্ঞার বিষয়। উহা প্রবৃত্তির নীচতা জ্ঞাপক কারণ, স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য, কর্ম্মক্ষমতা সব বিসর্জ্জন দিয়া যাহারা উক্ত বৃত্তি অবলম্বন করে তাহারা কাপুরুষ, তাহারা পৌরষধর্ম্মবর্জ্জিত। অতএব সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়া দেবতার অভিসম্পাত।



## বাণিজ্য

রবীন্দ্র নাথ তাঁহার একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, জাতীয় জীবনের ব্রাহ্মণ্যযুগ ও ক্ষাত্রযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে; এখন বৈশ্যযুগ চলিতেছে। সেইজন্য বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সভ্য জাতির মধ্যে বৈশ্য বৃত্তির মূল দশায় অন্যান্য বৃত্তির অন্তর্দ্দশা চলিতেছে। ইহাই আধুনিক যুগধর্ম্ম। কাজে কাজেই বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র বৃত্তিগুলি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় অটুট রাখা কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে,

এবং যুগ-ধর্ম্মানুসারে সকলকেই অল্প বিস্তর বৈশ্য বৃত্তির সেবা করিতে হইতেছে।

প্রকৃত বৈশ্য-বৃত্তি বলিলে কৃষি ও বাণিজ্যকেই বুঝায়। অতএব ক্ষুদ্রাকারেই হউক, আর বৃহদাকারেই হউক, কৃষিজাত, শিল্পজাত এবং খনিজ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়কেই বাণিজ্য বলা হয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশ কৃষিপ্রধান; সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যই আমাদের দেশের প্রধান বাণিজ্য-সম্ভার। অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় অর্থাগম কৃষির উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এবং খনি হইতে উত্তোলিত পদার্থ সমূহের বিনিময়েও জাতীয় অর্থ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে লব্ধ অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম।

ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লেখা গ্রন্থকার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গ ক্রমে যত টুকু বলা উচিত তাহাই উল্লেখ করা হইতেছে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এই কথাটী অতি সত্য তাই। বলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেই যে ব্যবসায়ী রাতারাতি বড় মানুষ হইবেন অথবা আলস্য, ঔদাস্য, ভ্রান্তি, অপটুতা প্রভৃতি অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও যে তাঁহার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে এবং সৌভাগ্য আনয়ন করিবে এবম্প্রকার ধারণা ভ্রান্তি-মূলক। সততা, পরিশ্রম, সুশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যবসায়ের প্রাণ স্বরূপ। সেগুলির অভাব ঘটিলে বাণিজ্যে

উন্নতি লাভ করা দূরে থাকুক, উক্ত ব্যবসায় অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। দেশের ও বিদেশের খ্যাতনামা স্বকৃত কর্ম্মী ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়-জীবন হইতে আমরা সহজে জানিতে পারি, যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন তাঁহারা একদিন না একদিন কৃত কর্ম্মের সুফল লাভ করিয়া উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, না জানিয়া শুনিয়াও ভালরূপ শিক্ষা লাভ না করিয়া কোন ব্যবসায় আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অবশ্য কোন বৃহৎ কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সেই স্থান হইতে ব্যবসায় সংক্রান্ত ভালরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে ব্যবসায় জীবনে একদিকে যেরূপ আনুকুল্য হইয়া থাকে অপর দিকে সেইরূপ ক্ষতির ভয়ও কম থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না। তাই বলিয়া কি ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তি উন্নতির সুযোগ অনুসন্ধান করিবে না? ব্যবসায়ের দিকে যাহাদের আন্তরিক আগ্রহ এবং স্বভাবিক অনুরাগ আছে তাহারা অন্য স্থান হইতে শিক্ষা লাভ না করিয়াও ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহাদের উন্নতির পথ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। ঐরূপে স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা আমাদের দেশে বহু লোক বড় বড় কারবারের মালিক হইয়াছেন।

কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে যে অল্প মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করা বাতুলতা মাত্র এবং তদ্দ্বারা বিশেষ

উন্নতির আশা করা যায় না। এইরূপ ধারণাও নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। তাঁহারা মনে করেন, বেশী টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিতে বসিলে অধিক লাভ হইবে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ এককালীন বেশী টাকা খাটাইয়া ব্যবসায় করিতে গিয়া লাভ করিবার পরিবর্ত্তে বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অবশ্য বড় কারবার পরিচালিত করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ পূর্ব্ব হইতে হয় না। তাহাছাড়া পূর্ব্বের অনভ্যাস হেতু ব্যবসায়ীজনোচিত পরিশ্রমের অপ্রাচুর্য্যও ঐ প্রকার ক্ষতির মূলীভূত কারণ হইতে পারে।

মোট কথা কোন বড় গদিতে ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষালাভ না করিয়াও ছোট আকারে (in small scale) কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। ক্ষুদ্রাকারে ব্যবসায় আরম্ভ করিলে একদিকে যেমন উহা বেশ শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি কাজের সঙ্গে সঙ্গে তৎ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহাছাড়া, যদি কোনক্রমে ব্যবসায় নষ্ট হয় তাহা হইলেও লোকসানের পরিমাণ মারাত্মক হয় না, সহজেই ধাক্কা সামলাইয়া লওয়া যায়। সুতরাং নূতন ব্যবসায়ী এবং অল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক এইরূপ লোকের পক্ষে ছোট ব্যবসায়ই ভাল।

এমন কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা ব্যবসায়

করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে ইচ্ছা করে অথচ মনোবলের অভাবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে করিতে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে থাকে। সাঁতার শিখিয়া জলে নামিতে যাওয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ, ঐ জাতায় ব্যবসায়-পরিকল্পনাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব ব্যবসায় বিষয়টী সর্ব্বেব হাতেকলমে করা কাজের উপর নির্ভর করে, সব সময় ইহা মনে রাখা উচিত। উহার সংগঠনের মূলে চিন্তা ধারা থাকিলেও উহার পরিচালনা-মূলে কায়িক পরিশ্রমই অধিক কার্য্যকারী হয়।

নূতন ব বসায়ীদিগের একটী বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বাজারে কোন্ কোন্ জিনিষের চাহিদা বেশী তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে শীঘ্র শীঘ্র ব্যবসায় উন্নত হইয়া উঠে। আমরা সাধরণতঃ দেখিতে পাই যে, অধিকাংশ খনিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে একটু বেশী পরিমাণ টাকার দরকার হয়। তাহাছাড়া উক্ত দ্রব্যসমূহের চাহিদা খাদ্য শস্যাদির তুলনায় কম। পরন্তু খাদ্য শস্যাদির মূল্যও ঐ সকল জিনিষের মূল্য অপেক্ষা কম। কিন্তু এইরূপ হইতে পারে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে খাদ্য শস্য এবং কৃষিজাত অন্যান্য জিনিষের প্রচুর আমদানী রহিয়াছে অথচ শিল্পজাত এবং খনিজ প্রভৃতি দ্রব্যের অভাব আছে। সে ক্ষেত্রে কোন জিনিষের কারবার ভাল চলিবে না চালিবে সে বিষয় ব্যবসায়ীকে বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। আমাদের নিত্য

ব্যবহার্য্য জিনিষের ব্যবসায় করিলে সে সকল জিনিষের কাটতি হইয়া থাকে সত্য; তাই বলিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় কোন কাঁচা মালের ব্যবসায করিতে যাওয়া নূতন ব্যবসায়ীর পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহার পর ঐ কাজ করিতে যাওয়া উচিত। আর একটী বিষয় মনে রাখা উচিত যে, যে মালের কাটতি অধিক তাহা অল্প লাভেও ছাড়িয়া দেওয়া ভাল।

মাল কেনার উপরেই ব্যবসায়ের লাভ লোকসান কতকটা নির্ভর করে একথা সত্য। যখন কোন জিনিষ অল্প দরে কিনিতে পাওয়া যায় তখন উহা কিনিয়া রাখিলে, পরে তাহাতে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। যে মাল কিছুদিন ঘরে রাখিয়া বিক্রয় করা যায় তাহাকে 'রাখীমাল' বলে। পল্লী অঞ্চলে ধান চা'ল, ডাল কলাই, হলুদ, লঙ্কা, গুড়, নানাবিধ মসলা প্রভৃতি রাখী-মালের কারবার চলে। ছোট ব্যবসায় হইতে ক্রমশঃ অধিক মূলধন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বড় বড় এবং বহুমুখী কারবার চালান যাইতে পারে। ছোট ব্যবসায় হইতে ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া কিরূপে বৃহৎ কারবার গড়িয়া তোলা সম্ভব, মাড়োয়ারীদের গদিগুলি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের মহেশ ভট্টাচার্য্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যবসায়ীরা কিরূপে অতি সাধারণ অবস্থা হইতে নিজ নিজ সৌভাগ্য-সোপান গঠন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালী কিছুনা কিছু জানেন।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর তীব্র উচ্চাকাঙ্খা এবং শ্রমশীলতা থাকা দরকার। উহা দ্বারাই উন্নতির সোপান দৃঢ় হয়।

বাজারে গিয়া আমরা বহু জিনিষ দেখিয়া থাকি। কিন্তু উহাদের কোন জিনিষটী কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা আমরা অনেকেই জানি না। ঐ বিষয় জানা থাকিলে বাণিজ্যাবলম্বী-দিগের সুবিধা হইবে বলিয়া, বাঙ্গলা দেশে কোথায় কোন জিনিষ উৎপন্ন হয়, এবং কোথায় কোন জিনিষের চাহিদা বেশী নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতা। শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, উহা সমগ্র পৃথিবীর একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। কলিকাতার কোন্ কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ জিনিষ সুবিধা দরে কিনিতে পাওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহা বিস্তৃত ভাবে লেখা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, বড় বাজারে বড় বড় মহাজনের গদি আছে। সেখানে সর্ব্ববিধ মাল প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। সুতরাং অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বড় বাজারে পড়তানুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম দামে মাল কেনা যায়। দুই চারি বার ঐ অঞ্চলে যাতায়াত করিলে ঐ বিষয়ে সহজে ব্যবসায়ীদিগের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া থাকে।

২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। পোর্ট ক্যানিং বা মাতলা অঞ্চলে বহু ধানের গোলা আছে। তাহাছাড়া ঐ অঞ্চল হইতে সুন্দর বনের প্রচুর জ্বালানী কাঠ

ও বিচুলি কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে আমদানী হয়। খিদিরপুর অঞ্চলে জাহাজ ও ষ্টীমার মেরামতের বড় কারখানা থাকায় ঐ স্থানে পুরাতন লোহা ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। ( বহু শ্রমিক ঐ অঞ্চলে বাস করে বলিয়া ঐ স্থানে খাদ্য শস্যাদির ব্যবসায় ভাল ভাবে চলিয়া থাকে।) 

বজবজে কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ তৈলের বড় বড় আড়ৎ আছে। ঐ স্থান হইতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তৈল সরবরাহ করা হয়। বারুইপুর অঞ্চল হইতে প্রচুর কাঁচা মাল প্রত্যহ কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। কাশীপুরে চিনির কারবার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। হাসানাবাদ ও বসুরহাট হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে লোণা জলের মাছ ( বাগ্‌দা চিংড়ী, ভাঙ্গন, পারস্য, ভেট্‌কি ইত্যাদি ) কলিকাতার বাজারে রপ্তানী হয়। ইটিণ্ডা হইতে মাছ, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি চালান হয়। গোবরডাঙ্গা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইক্ষুগুড় ও চিনি এবং তরিতরকারী পাওয়া যায়। দত্তপুকুর হইতে প্রত্যহ প্রচুর দুগ্ধ ও ছানা কলিকাতার বাজারে প্রেরিত হয়।

যশোহর জেলা—জেলা সহরের চিরুণী প্রসিদ্ধ। কেশবপুর ও কোটচাঁদপুরে ভাল খেজুর চিনি এবং চিটেগুড় পাওয়া যায়। ঝিকরগাছা ধান, পাট, হলুদ, লঙ্কা, খেজুরগুড়, ও নানা প্রকার কলাই রপ্তানীর জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক ফড়িয়া কলিকাতা হইতে এখানকার হাটে আসিয়া নানাবিধ তরকারী কিনিয়া লইয়া

যায়। ত্রিমোহিনী ও চিংড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। নপাড়ায় নারিকেল, গুড়, পাট এবং ঝাঁটার কাঠির বড় আড়ৎ আছে। নড়াইলেও ঐ সকল জিনিষের কারবার আছে। বনগ্রাম হইতে প্রচুর তরকারী কলিকাতায় চালান হয়। এখানে পাট, গুড়, নানাবিধ ডাল-কলাই ইত্যাদি আমদানী হয়। এই জেলার নানা স্থানে ধান, পাট, বাঁশ, নরম কাঠ, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি পাওয়া যায়। কালীগঞ্জ বা শিবনগরে প্রচুর খেজুর গুড় আমদানী হয়।

খুলনা জেলা—সাতক্ষীরা মহাকুমার বড়দল খুব বড় বাণিজ্য-কন্দ্র, সেখানে প্রতি রবিবারে হাট বসে। ধান, চাউল, হলুদ, লঙ্কা, খেজুর ও ইক্ষু গুড়, পান, নানাবিধ ডাল-কলাই প্রভৃতি বহুল পরিমাণে আমদানী হয়। খুলনা হইতে ষ্টীমারে ঐ স্থানে যাতায়াত করা সুবিধাজনক। তাহাছাড়া কপিল মুনি, চুকনগর, ডুমুরিয়া, পাটকেলঘাটা প্রভৃতি স্থানেও ঐ সকল জিনিষ আমদানী হইয়া থাকে। খুলনা সহর একটী বড় বাণিজ্যস্থান। খুলনা ও বাগেরহাট হইতে প্রচুর নারিকেল ও সুপারী চালান যায়। বাগের হাটের সূতি এবং রেশম বস্ত্র প্রসিদ্ধ। সাতক্ষীরা অঞ্চলে নানা স্থানে খেজুর গুড়, হলুদ, লঙ্কা, ধান, পাট, ডাল-কলাই প্রভৃতি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে প্রচুর মাদুর প্রস্তুত হয়। এই জেলার মধ্যে নদীতীরস্থ বহু পল্লীতে নরম কাঠ, শিমুল তূলা, বাঁশ প্রভৃতি জিনিষ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সুন্দরবন হইতে

গোলপাতা, সুন্দরী কাষ্ঠ, মধু প্রভৃতিনানা স্থানে চালান হয়। দক্ষিণাঞ্চল হইতে গব্য এবং ভৈঁষা ঘৃত চালান হইয়া থাকে।

নদীয়া জেলা—কুষ্টিয়াতে কাপড় ও গেঞ্জির কল আছে। শান্তিপুরে সুন্দর সুন্দর তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্প বিখ্যাত। গ্রীষ্মকালে ঐ জেলার নানা স্থান হইতে প্রচুর আম্র রপ্তানী হইয়া হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলা—কাশিমবাজার ও বহরমপুর রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার নানা স্থানে ছোলা ও অড়হর উৎপন্ন হয়। খাগড়া অঞ্চলের বাসন-শিল্প প্রসিদ্ধ। বালুচরে উৎকৃষ্ট চেলী কাপড় প্রস্তুত হয়। লালগোলা অঞ্চলে প্রচুর ডাল-কলাই পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে গ্রীষ্মকালে আম্র রপ্তানী হয়।

হাওড়া জেলা—হাওড়া একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বহু স্থানে চট, তেল, চাউল, আটা প্রভৃতির কল আছে। উলুবেড়ে হইতে বর্ষাকালে প্রচুর ইলিস মাছ কলিকাতায় রপ্তানী হয়। এই জেলার নানা স্থান হইতে প্রচুর চাঁপা কলা এবং বাগনান ও মণ্ডলঘাট অঞ্চল হইতে প্রচুর পান প্রত্যহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

হুগলী জেলা—চন্দননগরে (ফরাস্‌ডাঙ্গা) উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হয়। বৈদ্যবাটীতে খুব বড় হাট বসে। ঐ স্থান হইতে নানা প্রকার তরকারী কলিকাতায় চালান যায়। কাঞ্চননগরে

সুন্দর সুন্দর ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তারকেশ্বরে প্রচুর গোলআলু পাওয়া যায়। ধান, গোল-আলু, ইক্ষু, কলা প্রভৃতি এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। প্রতি বৎসর এই জেলার নানা স্থান হইতে প্রচুর ইক্ষু গুড় কলিকাতায় রপ্তানী হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান জেলা—বর্দ্ধমান প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ঐ স্থানের সীতাভোগ ও মিহিদানা অনেক জায়গায় চালান যায়। কাটোয়ার গরদ ও তসর শিল্প প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে প্রচুর ইক্ষু গুড় এবং উৎকৃষ্ট ডেঙ্গু ডাঁটা উৎপন্ন হয়। আসানসোলে কয়লার খনি এবং পশম-শিল্প আছে। ঐ স্থানে সুলভ মূল্যে দেশী কম্বল ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই স্থানে ই, আর, রেলওয়ের হেড্ কোয়ার্টার আছে বলিয়া অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। কাজে কাজেই খাদ্য শস্যাদি এবং অন্যান্য অনেক জিনিষের চাহিদা আছে। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি এবং মৃৎ শিল্প ( টালি প্রস্তুতের কারখানা ) বিখ্যাত। সীতারাম-পুরে লৌহখনি আছে। বরাকরে এবং হীরাপুরে সুবৃহৎ লৌহ–কারখানা আছে। অতএব উক্ত স্থানে বহু শ্রমিক বাস করায় খাদ্যশস্যাদির চাহিদা আছে। এই জেলার নানা স্থানে ধান, ইক্ষু, এবং প্রচুর গোলআলু উৎপন্ন হয়।

বীরভূম জেলা—সিউড়ী অঞ্চলের রেশম ও তসর শিল্প বিশেষ উন্নত। রামপুরহাটে সুন্দর সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়। ইলমপুরে গালা প্রস্তুতের কারখানা আছে। এই জেলার জঙ্গল

হইতে কিছু কিছু কাঠ চালান হয়। স্থানে স্থানে ধান, ইক্ষু ও ডাল-কলাই পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলা—বাঁকুড়া সহর একটী বাণিজ্য-কেন্দ্র। বিষ্ণুপুর তামাকের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এই জেলায় লোক সংখ্যা কম হইলেও নানা স্থানে রেশম, গালা, তামা, পিত্তল প্রভৃতির কারখানা আছে। এই জেলায় কয়েকটী কয়লার খনি আছে। তাহাছাড়া জঙ্গল হইতে কিছু কিছু কাঠ সংগ্রহ করা হয়।

মেদিনীপুর জেলা—মেদিনীপুর প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান। ঐ অঞ্চল হইতে ঘৃত, মাখন প্রভৃতি রপ্তানী হয়। ঘাটাল রেশমী কাপড় এবং নিত্য ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্রের জন্য প্রসিদ্ধ চন্দ্রকোনা সূক্ষ্মবস্ত্র এবং ঘৃতের জন্য বিখ্যাত। কাঁথি হইতে ধান, চাল, মাদুর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। এই অঞ্চলে ঘৃত ও মাখন পাওয়া যায়। খড়্গপুর এবং গড়বেতা বড় বড় গঞ্জ। খড়্গপুরে বি, এন, রেলওয়ের বড় কারখানা থাকায় ঐ স্থানে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্থান একটী বড় গঞ্জে পরিণত হইয়াছে। উক্ত স্থানে খাদ্য-শস্যাদি এবং অন্যান্য বহু জিনিষের চাহিদা আছে।

রাজসাহী জেলা—রাজসাহীর রেশম শিল্প প্রসিদ্ধ। নাটোর হইতে খেজুর গুড়, কাঁচা গোল্লা সন্দেশ, প্রচুর মধু এবং তিল রপ্তানী হয়। নওগাঁয়ে ভাল ভাল রেশমী চাদর

প্রস্তুত হয়। কলম পিত্তল ও কাঁসা-শিল্পের, জন্য বিখ্যাত। এই জেলায় নানা স্থানে প্রচুর তিল, হলুদ, ইক্ষু গুড়, গোল আলু, পেঁয়াজ, পান, আদা প্রভৃতি পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে দেশলাইএর জন্য নরম কাঠ পাওয়া যায়। জেলার অধিকাংশ স্থানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।

রংপুর জেলা—জেলা সহর একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান। কুড়িগ্রামে হাতীর দাঁত এবং মহিষ শৃঙ্গের শিল্পালয় আছে। এই জেলার নানা স্থানে, পাট, আদা, গোলআলু, ধান, কাঁঠালবীজ, তামাক এবং সতরঞ্চি পাওয়া যায়। এই জেলার চাউল জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কার্শিয়ং, কালিম্পং ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়।

মালদহ জেলা—ইংরাজবাজার একটী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়কেন্দ্র, এখানকার পিত্তল-কাঁসা-শিল্প প্রসিদ্ধ। মালদহ জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর ফজ্‌লি আম চালান যায়। বহু গৃহস্থ বাগানের আম বিক্রয় করিয়াই বৎসরের অন্ন সংস্থান করে।

বগুড়া জেলা—সান্তাহার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। হিলিতে প্রচুর ধান আমদানী হয়; এখানে অন্যূন ২০টী চাউলের কল আছে। স্থানে স্থানে পাট উৎপন্ন হয়। এই জেলার আয়তন অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু অধিকাংশ স্থান জলা বলিয়া এই জেলায় অপর্য্যাপ্ত ধান জন্মে।

পাবনা জেলা—জেলা সহরটী বড় বাণিজ্য-স্থান। ঐ স্থানে গেঞ্জীর কল আছে; তাঁতের কাপড় ও পাওয়া যায়।

পাবনার পিত্তল-কাঁসা-শিল্প উন্নত। সিরাজগঞ্জ পাট ব্যবসায়ের বৃহত্তম কেন্দ্র। ঐ স্থান হইতে নদীপথে প্রচুর পাট রপ্তানী হয়। পাবনা জেলায় প্রচুর সরিষা, হলুদ ও পাট উৎপন্ন হয়। এই জেলার বিলময় স্থানগুলিতে যথেষ্ট ধান জন্মে।

জলপাইগুড়ি—জেলা সহর একটী ব্যবসায়কেন্দ্র। বাউড়া হইতে পাট, তামাক ও সরিষা রপ্তানি হয়। ঐ অঞ্চলের বাসনশিল্প উন্নত। হলদিবাড়ী একটী বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র, সেখান হইতে পাট এবং হলুদ রপ্তানী হয়। এই জেলার স্থানে স্থানে কাঠ, চা, ধান, পাট, গোলআলু এবং ইক্ষু পাওয়া যায়।

দার্জ্জিলিং জেলা—দার্জ্জিলিং প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান। ঐ স্থানে চা, কমলা লেবু, জঙ্গলের ভেনিস্তা কাঠ, তিব্বতীয় পশম-বস্ত্র এবং কাষ্ঠশিল্পজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কার্সিয়ং সহরটী ভাল বাণিজ্য-স্থান। এখানে প্রচুর চা এবং কমলা লেবু পাওয়া যায়।

ঢাকা জেলা—ঢাকা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। ঐ স্থানের বস্ত্র-শিল্প, শঙ্খ-শিল্প, বাসন-শিল্প এবং সাবান-শিল্প বিশেষ উন্নত। নারায়ণগঞ্জ সুবৃহৎ পাট রপ্তানির কেন্দ্র। এই জেলার নানা স্থানে প্রচুর নারিকেল, সুপারী, গাজরী কাঠ প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর শীতল-পাটী প্রস্তুত হয়।

ময়মনসিংহ জেলা—জেলা সহর একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-

স্থান। টাঙ্গাইলের তাঁতের কাপড় বিখ্যাত। কাকমারীতে কাঁসার বাসন নির্ম্মিত হয়। জামালপুর মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। নেত্রকোনার এণ্ডিচাদর প্রস্তুত হয়। ইসলামপুরে পিত্তল-কাঁসার কারখানা আছে। বাজিতপুরের বস্ত্র-শিল্প উন্নত। এই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট বেগুন ঢাকা প্রভৃতি স্থানে চালান যায়।

ফরিদপুর জেলা—প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ফরিদপুর ও গোয়ালন্দ। মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ী হইতে পাট, খেজুর গুড় এবং পটোল রপ্তানী হয়। স্থানে স্থানে উত্তম শীতল-পাটী নির্ম্মিত হয়।

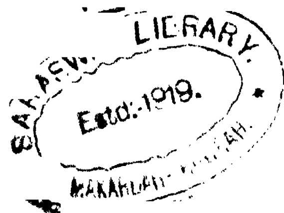
বরিশাল জেলা—প্রধান বাণিজ্য-স্থান বরিশাল। ভোলার নারিকেল তৈলের কারখানা বিখ্যাত। এখানে প্রচুর সুপারী পাওয়া যায়। ঝালকাটীতে প্রচুর পটোল, নারিকেল ও সুপারী আমদানী হয়। পটুয়াখালি পটোল ও সুপারীর জন্য প্রসিদ্ধ। বরিশালের বালাম চাউল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র চালান হয়। এই জেলায় প্রচুর মশুর উৎপন্ন হয়।

চট্টগ্রাম জেলা—চট্টগ্রাম প্রসিদ্ধ বন্দর এবং সুবৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে একটী লৌহের কারখানা আছে। সরু বাঁশ, কাঠ, মোটা বেত প্রভৃতি এই জেলার প্রধান পণ্য দ্রব্য।

ত্রিপুরা জেলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কুমিল্লা হইতে প্রচুর লঙ্কা, হুকার খোল ও নল্‌চে নানাস্থানে রপ্তানী হয়। চাঁদপুর

পাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র। হাজিগঞ্জে বিস্তর সুপারী পাওয়া যায়।

নোয়াখালি জেলা হইতে প্রচুর লঙ্কা এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে ছাতার বাঁট ও বেত রপ্তানী হয়




## যৌথ কারবার

আমাদের দেশে সাধারণতঃ অর্থশালী ব্যক্তিরা এক একটী কারবার পরিচালনা করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে, বহু যৌথ কারবার প্রচলিত দেখা যায়। বহু লোকের টাকা একত্র মিলিত করিয়া বড় বড় কারবার পরিচালিত করা হয় এবং উক্ত কারবারের অংশীদারদিগের মধ্যে, মূলধনের হারাহারি মতে, মোট লভ্যাংশ ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদত্ত টাকার ( invested money ) তিন চার গুণ লভ্যাংশও বৎসরান্তে পাওয়া যায়। চট কল, কাপড় কল, কাগজ কল, লোহার কারখানা, রেলওয়ে, ষ্টীমার সার্ভিস, ট্রামওয়ে, ব্যাঙ্ক, চা ব্যবসায়, কয়লা ও তেলের খনি প্রভৃতি সংক্রান্ত বড় বড় কারবারের অধিকাংশই যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত হয়।

যৌথ কারবারের বিশেষত্ব এই যে, ধনীরা ঐ উদ্দেশ্যে কিছু কিছু টাকা নিয়োজিত করিলে ধনিকত্ব-সমস্যা (problem of capitalism) কতক পরিমাণে সমাহিত হয়। তদ্দ্বারা এক এক স্থানের পুঞ্জীভূত অর্থরাশি সাঙ্কলিত হইয়া অভাব-গ্রস্ত লোকদিগের অর্থাভাব দূরীকরণে সাহায্য করিয়া থাকে। ঐ বিষয়টীর প্রতি দেশের প্রত্যেক ধন-কুবেরের বিশেষ লক্ষ্য থাকা দরকার। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, যৌথ কারবার দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের অভাব মোচন করিতে পারেন।

ইংরাজ শাসনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও বহু যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় পরিচালক-দিগের অবহেলা অথবা বিচক্ষণতার অভাবে কোন কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়। সে জন্য উহার উপর সাধারণের আস্থা কমিয়া যাইতেছে। তাহা হইলেও ঐ বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতির জন্য দেশবাসীর সচেষ্ট হওয়া উচিত। দেশে যত অধিক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে দেশের শ্রীবৃদ্ধিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। যৌথ প্রণালীর সুবিধা এই যে, কোন অংশীদারের বাণিজ্য বিষয়ক বুদ্ধির এবং সময়ের অভাব থাকিলেও কোন যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া তিনি পরোক্ষ ভাবে সঞ্চিত টাকার সদ্ব্যবহার এবং লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন। তাহা ছাড়া উহার সংস্রবে বহু লোক প্রতিপালিত হইতে পারে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের অধিকাংশ

যৌথ ব্যবসায় সুপরিচালনার অভাবেই নষ্ট হইয়া যায়। পরিচালকগণ প্রত্যেকে পৃথক ভাবে, ঐরূপ অবনতির জন্য দায়ী, কারণ, তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন এক এক জনের উপর উহার পরিচালন-ভার অর্পণ করিয়া থাকেন যাঁহার প্রকৃত যোগ্যতা না থাকিতেও পারে। অতএব পরিচালকবৃন্দ বিশেষ চেষ্টা করিলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের বিস্তর উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিচালকমণ্ডলীর প্রত্যেকেরই উক্ত ব্যবসায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে, ব্যবসায় নষ্ট হইতে পারে না। কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ঐ রূপ ব্যবসায়ের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করা তাঁহাদের ধর্ম্মাঙ্গ বিশেষ এইরূপ মনে করা উচিত।

আমাদের দেশের কর্ম্মপ্রার্থী যুবকবৃন্দ, সততা এবং উৎসাহ বজায় রাখিয়া বহু যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন। তাহাতে জাতীয় আর্থাগমের নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইতে পারে ইহা সুনিশ্চিত। সব সময় তাঁহাদের মনে রাখা উচিত—Honesty is the best policy বা সাধুতাই সার নীতি।



## ছোট ব্যবসায়

সকলের পক্ষে বৃহৎ আকারে যৌথ কারবার বা ব্যক্তিগত ভাবে আড়ৎদারী, গোলদারী প্রভৃতি ব্যবসায় করা সম্ভব নহে। যাঁহার মূলধন কম, কাজ করিবার লোক কম অথচ ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে নিজের রুচি আছে, সেইরূপ লোকের পক্ষে ছোট ব্যবসায় চালানই প্রশস্ত, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐরূপ লোক ছোট মুদিখানা, ছোট কাপড়ের দোকান, ধান-চাল, ডাল-কলাই ইত্যাদির ছোট দোকান, পান-তামাকের দোকান, মসলাদির দোকান, খাবারের দোকান ইত্যাদি চালাইতে পারেন। যদি পরিশ্রমের অভাব না হয় এবং যাহাদের নিকট টাকা আদায় হইবে না এইরূপ লোকদিগকে ধারে জিনিষ পত্র দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার ছোট ছোট ব্যবসায় নষ্ট হইবার কোন আশু কারণ পরিলক্ষিত হয় না। ঐ রূপ ব্যবসায় সহরেও চলে, পল্লী অঞ্চলেও চলে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সন্দেহ স্থলে ধারে কোন জিনিষ না দেওয়াই বিধি। যাহাতে ছোট দোকান আড্ডাখানায় পরিণত না হয়, সে বিষয়ে দোকানদারের নিজের ও তাঁহার হিতৈষী বন্ধুবান্ধবদিগের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত। উহার অন্যথা হইলে ছোট ছোটব্যবসায়ের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় উপস্থিত হয়। ঐ রূপ ব্যবসায়ীকে সর্ব্বক্ষেত্রে মিষ্টভাষী ও সদালাপী হইতে হয়। এই সকল বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে ঐ রূপ ছোট ব্যবসায়ে সহজে উন্নতি লাভ করা যায় না।

## রাখী মালের ব্যবসায়

পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাঁহারা হয়ত দুই পাঁচ শত টাকার কারবার চালাইতে পারেন অথচ নানা কারণ বশতঃ দোকানদারী করিবার উপায় তাঁহাদের নাই। টাকাটা ঘরে পড়িয়া থাকিলে কোন লাভ হয় না, পরন্তু এমন এমন সময় আসে যখন উক্ত পুঁজী টাকা হইতেও অধিকাংশ খরচ করিয়া ফেলিতে হয়। ঐরূপ গৃহস্থদিগের পক্ষে রাখীমালের ব্যবসায় অত্যন্ত উপযোগী। অনেকে ঐরূপ ব্যবসায় করিয়া থাকেন। উহার বিশেষত্ব এই যে, সময় মত সুবিধা দরে জিনিষ কিনিয়া রাখিলে বাড়ীতে বসিয়াই বিনা ঝঞ্ঝাটে কিছু টাকা লাভ করিতে পারা যায়। রাখী মাল কিনিতে হইলে শীতকালই প্রশস্ত। ঐ সময় আমন ধান, নানা প্রকার চা'ল, গুড়, শুষ্ক লঙ্কা, সুপারী, নারিকেল, হলুদ, নানা প্রকার ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ঐ সকল জিনিষ কেনা থাকিলে বর্ষার প্রারম্ভেই দেড় গুণ, এমন কি, দ্বিগুণ মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। উক্ত ব্যবসায়ের উন্নতি টাকার ফেরা খাটানর উপর নির্ভর করে। টাকা অধিক দিন আবদ্ধ থাকিলে ক্ষতি হয়। সেইজন্য অপেক্ষাকৃত অল্পলাভ জনক দর পাইলেই কিছু মাল অথবা সম্পূর্ণ মাল ছাড়িয়া দিয়া সস্তাদরে অন্য যে জিনিষ পাওয়া যায় তাহা কিনিতে হয়। বাকীমূল্যে খুচরা

মাল বিক্রয় করিলে রাখী মালের কারবারে লাভের বদলে ক্ষতি হয়। পাইকারের নিকট মাল বিক্রয় করাই উত্তম নীতি। উক্ত ব্যবসায় দ্বারা পল্লী অঞ্চলের বহু পরিবার সারা বৎসরের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া থাকে।

## সাময়িক ব্যবসায়

কলিকাতা প্রভৃতি সহরে দেখা যায় যে, দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের কতকগুলি লোক বৎসরের নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে, সামান্য দশ পনর টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় করিতে আসে। এক এক যাত্রায় দেড় মাস দুই মাস সহরে থাকিয়া নিজ নিজ খরচ পত্র বাদেও তাহারা দুই তিন মাসের সংসার খরচের মত টাকা উপার্জ্জন করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে, শীতল পাটী, মাদুর, পাখা, আম, কাঁটাল, ডাব প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। বর্ষারম্ভে ফজ্‌লী আম, আতা প্রভৃতি বিক্রয় করে। শীতকালে কপি, কমলালেবু ইত্যাদি বিক্রয় করিয়াও তাহারা টাকা রোজগার করে। কেহ কেহ বর্ষা অন্তে কলিকাতায় আসিয়া হাঁস ও মুরগীর ডিম ফিরি করে। গরম পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ডিমের ব্যবসায় চলে। এই সকল কাজ ছাড়া কেহ হয়ত গামছা, কেহ মিঠাই, কেহ কুলপি ও মালাই

বরফ, কেহ গব্য ঘৃত ইত্যাদি ফিরি করিয়া বেশ দু'পয়সা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর ব্যবসায়িদিগকে স্থায়ী ভাবে সহরে থাকিতে দেখা যায় না। সময় মত যে যার দেশে ফিরিয়া চাষ আবাদ ইত্যাদি নিজ নিজ কাজ দেখিয়া থাকে। এইরূপে বিদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহারা ধনবৃদ্ধি করে।

শুধু সহরে নহে, পল্লী অঞ্চলেও অনেককে সাময়িক ব্যবসায় করিতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে অনেকে অল্প মূলধনে এক গ্রাম হইতে আম কাঁটাল ইত্যাদি কিনিয়া নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী গঞ্জে লইয়া বিক্রয় করে। আবার শীতকালে, গুড়, কাঁচা লঙ্কা, মূলা, বেগুন, কপি ইত্যাদি পাইকারী দরে ক্রয় বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। কেহ কেহ দূরে না গিয়াও প্রতি হাট বারে দশ বিশ টাকা মূলধন সহ প্রথম হাটে উপস্থিত হইয়া ঐ মূল্যের জিনিষ পাইকারী দরে কিনিয়া রাখে। হাটের মাঝামাঝি সময়ে টাকা প্রতি এক আনা, দেড় আনা বেশী দর পাইলেই উক্ত মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। ঐ সকল লোক এই প্রকারে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে।

অনেকে ঐ বিষয়ে অন্ধ অথবা উদাসীন এরূপ দেখা যায়। শিক্ষিত লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের উপযুক্ত লোকদিগকে এইরূপ সাময়িক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের অর্থোপার্জ্জনের আনুকুল্য করিতে পারেন।

## বাঙ্গালীর ব্যবসায় নষ্ট হয় কেন

আমাদের ব্যবসায় নষ্ট হইবার মুলে প্রধানতঃ স্থবন্দোবস্তের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত বড় বড় কারবারগুলি এক পুরুষ, দুই পুরুষ, বড় জোর তিন পুরুষের বেশী চলিতে দেখা যায় না। তাহার প্রধান কারণ, কোন মালিকের কতকগুলি উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহাদের সকলে চল্‌তি কারবারের উপর সমান স্বার্থবান থাকেন না। তাহার ফলে উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কার লক্ষণ দেখা দিলেই বড় বড় কারবারের মালিকদের কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমতঃ নিজেদের মধ্যে যতই পারিবারিক গোলযোগ থাকুক না কেন, ব্যবসায়ের উপর কোনরূপ আক্রোশ বিস্তার করা উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়টী বজায় রাখিবার জন্য উহার স্বার্থকে বড় মনে করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার উপর উক্ত ব্যবসায় পরিচালনের ভার অর্পণ করা উচিত। তাহাছাড়া সকল মালিক একত্র হইয়া এমন কতকগুলি বিধি প্রস্তুত করা উচিত যাহাতে সকলেই বাধ্য থাকেন। এইরূপ না করিলে চল্‌তি কারবার বাঁচান কঠিন হয়।

বাঙ্গালীর বড় ব্যবসায় নষ্ট হইবার আর একটী প্রধান

কারণ কোন কোন কর্ম্মচারীর অসততা। অতএব কারবারের মালিকগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যাহাতে ঐ প্রকার অসততা দ্বারা ব্যবসায় নষ্ট না হয়। কোন ক্রমেই ঐরূপ ব্যাপারের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

বড় কারবার করিতে গেলেই অন্যের নিকট টাকা বাকী পড়িয়া থাকে। যে সকল ব্যবসায়ী বাকীপড়া টাকা আদায় করিবার জন্য একটী পৃথক তহবিল (Reserve fund) না রাখেন, তাঁহারা একটী সাংঘাতিক ভুল করেন। কারবার ভালরূপে চলিতে থাকিলে অনেকে ভুলিয়া যান যে, ভবিষ্যতে কোন দিন মন্দ সময় আসিতেও পারে। অনেক ব্যবসায়ী মনে করেন, কতকগুলি টাকা আটক রাখা অন্যায়। সুতরাং তাঁহারা সমগ্র মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয়া থাকেন। জমিদারগণ সমস্ত টাকায় সম্পত্তি খরিদ করেন; এবং তেজারতি (লগ্নী) মহাজনগণ সুদের লোভে পাই পয়সা পর্য্যন্ত খাতককে কর্জ দিয়া থাকেন। অতঃপর ব্যবসায়ে একটু মন্দা দেখা দিলেই অর্থাভাবে উহাকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার ফলে, অচিরে অধঃপতন দৃষ্ট হয়। সুতরাং যে মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করা হয়, তাহা ছোট হউক আর বড় হউক, মোট টাকার অন্ততঃ সিকি পরিমাণ টাকা মজুত রাখিয়া দিতে হয়। ইহাই সমস্ত ব্যবসায় রক্ষা করিবার মূল নীতি। এই নীতি পালন না করিয়া বহু বড় বড় কারবার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পৃথক তহবিল দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে কোন ব্যবসায় উন্নত বা স্থায়ী হইতে পারে না। লোকচক্ষে জাঁকাল হইলেও প্রকৃত পক্ষে অনেক কারবার অন্তঃসারশূণ্য ভাবে চলিতে থাকে। কাজে কাজেই উহার মালিক হঠাৎ একদিন দেউলিয়া হন, অথবা গুপ্ত ঋণ দায়ে পাওনাদার কর্ত্তৃক কারবার আবদ্ধ এবং বিক্রীত হয়। সমস্ত অরক্ষিত কারবারের পরিণাম ঐরূপ হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত অগ্নি, ঝড়, চুর ডাকাতি, প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাকের জন্য যদি একটা পৃথক তহবিল রাখা যায় তাহা হইলে আরও ভাল হয় কেননা, হঠাৎ কোন উৎপাৎ উপস্থিত হইলে অতি সহজে ধাক্কা সামলান যায়। মোট কথা, গতানুগতিক ভাবে অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ব্যবসায় করিলে চলিবে না। যাহাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বংশানুক্রমে এক একটী কারবার চলিতে পারে সে বিষয়ে দূরদৃষ্টি রাখিয়া নূতন প্রণালীতে কারবার পরিচালিত করা উচিত।

বিলাতে এমন বহু কারবার আছে যাহা সাত আট পুরুষ ধরিয়া উন্নতির সহিত চলিতেছে। অনেক স্থলে মূলধনের পরিমাণ সহস্র হইতে লক্ষ এবং লক্ষ হইতে কোটী টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। তাহাছাড়া সেগুলি যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিখুঁত ভাবে চলিয়া থাকে। ঐ সকল কারবারের মালিকদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের কারবার নষ্ট হইবার নহে

এবং কারবারই তাঁহাদের সর্ব্ব সুখের মূল। তাঁহারা বংশানুক্রমে উহার ফল ভোগ করেন। ঐ সকল কারবারের অধিকাংশ যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত হয়।

ব্যবসায় সংক্রান্ত শিক্ষার অভাবেও বাঙ্গালীর অনেক কারবার নষ্ট হয়। এক সময় বোম্বাই সহরের একজন কোটী-পতি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে সকল ছেলে লেখাপড়ায় খুব ধারাল হয় না, তাহাদিগকে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইয়া পৈতৃক কারবারে শিক্ষানবিশী করিতে দেওয়া হয়। এই রূপে দুই তিন প্রকার কারবারের জটিল তত্ত্বগুলি জানা হইলে তখন তাহাকে মূলধন দিয়া অন্য একটী বড় ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন আর তাহার ব্যবসায় নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী তরুণদিগের ঐরূপ শিক্ষানবিশী করিবার ধৈর্য্যের যথেষ্ট অভাব আছে। অবশ্য প্রথমেই বড় ব্যবসায় আরম্ভ করা সকল বাঙ্গালী সন্তানের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেরূপ ক্ষেত্রে অতিশয় ক্ষুদ্র আকারে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে মারাত্মক ক্ষতি হইবার ভয় থাকে না। কিন্তু বড় কারবারের পরিচালন-ভার কোন কাঁচা হাতে কদাচ দেওয়া উচিত নহে।

বাঙ্গালীর ব্যবসায় নষ্ট হইবার আর একটী প্রধান কারণ হঠকারিতা। অত্যন্ত অস্থির হইয়া, পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়া

কোন কারবার আরম্ভ করিলে অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য কোন কারবার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞদিগের সহিত এবং হিতৈষী বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা উচিত। ঐরূপ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা কম থাকে। পূর্ব্বোক্ত কারণের জন্য ব্যবসায় ব্যাপারে হঠকারিতা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কাল বিশেষে ব্যবসায়ের ক্ষতি সহ্য করিয়াও উহাতে লাগিয়া থাকিলে পরে যখন সুযোগ আসে তখন সমস্ত ক্ষতি পূরণ হয়। কোন ব্যবসায় ভাল ভাবে চলিতে থাকিলে মালিকগণ নিজেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন লাভবান হন অন্য দিকে তেমনি বহু দরিদ্র পরিবার প্রতিপালন করা হয়। ফলতঃ প্রকারান্তরে পুণ্য সঞ্চয় এবং লোক সেবাও করা হয়। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী-দিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

## কৃষি সম্বন্ধে দুই একটী কথা

জাতীয় অর্থাগমের দিক হইতে দেখিতে গেলে কৃষি কার্য্যকেই সর্ব্ব প্রথম স্থান দিতে হয় কারণ, কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার পুষ্ট হয়। সেই জন্য কৃষি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের

কয়েকটী প্রদেশ বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা দেশ অত্যন্ত উর্ব্বর। গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে ভারতবর্ষকে বিশেষতঃ উক্ত প্রদেশদ্বয়কে কৃষি-প্রধান ভূভাগ বলা হয়। কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যকে অত্যন্ত অবহেলার চক্ষে দেখা হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ বিষয়ে যত্নহীন বলিয়া আমাদের কৃষির যথোপযুক্ত উন্নতি হয় না। একেত আমাদের কৃষকেরা অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং নানা ভাবে নিষ্পেষিত তাহাতে আবার তাহারা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপদেশ, উৎসাহ এবং ধনীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পায় না। কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া মামুলী প্রথানুযায়ী ও গতানুগতিক ভাবে চাষ আবাদ করে। কাজে কাজেই তাহারা কৃষি কার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

সময় সময় অজ্ঞতার জন্য তাহাদের সারা বৎসরের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইয়া যায়। কোন্ মাটীর প্রকৃতি কিরূপ, কোন্ মাটীতে কি কি ফসল ভাল জন্মে, কোন্ ফসলের জন্য কি কি সার ভাল, সাধারণতঃ যে সময় যে নির্দ্দিষ্ট ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য সময়ে উৎপন্ন করিলে ভাল হয় কি মন্দ হয় সে সকল বিষয়ে আমাদের প্রায় কোন কৃষকই চিন্তা করে না। উক্ত বিষয়গুলি অতি স্থূল অথচ

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যখন পাটের দর বেশী ছিল তখন কৃষকেরা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট উৎপন্ন করিত। কিন্তু যখন পাটের বাজারের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে তখন সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা পাট চাষ হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। সে দোষ তাহাদের অশিক্ষা এবং স্থূল বুদ্ধির। তাহারা কৃষি বিষয়টী কোন দিন ব্যাপক ভাবে ধারণা করিতে শিখে নাই। কোন ফসল উৎপন্ন করিলে অধিক অর্থাগম হইবে সে বিষয়ে খুব কম কৃষকই চিন্তা করে।

কৃষকদিগের জমির উৎপন্ন দ্রব্য কিছুদিন ঘরে মজুত রাখিয়া সুবিধামত দর পাইলে তবে বিক্রয় করিতে হয়। অনেক সময় দু'চার মাস, ছ'মাস এমন কি প্রায় এক বৎসর যাবৎ কোন কোন মাল ঘরে মজুত থাকে। তাহাতে চাষীরা অনেক সময় বিশেষ বিপন্ন হয় কারণ, মাল আটক থাকিলে নগদ পয়সা হাতে আসে না। অতএব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাহাদের দখলীয় সমগ্র জমিতে ধান, পাট, হলুদ, লঙ্কা, ইক্ষু প্রভৃতি বড় ফসল না করিয়া জমির কতকাংশে তরি-তরকারী যেমন—বেগুণ, পটোল, মূলা, উচ্ছে, কুমড়া ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া তাহা নিকটবর্ত্তী হাট বাজারে বিক্রয় করিলে প্রায় রোজই কিছু কিছু অর্থাগম হয়। তাহার ফলে অর্থের দারুণ অভাব দূরীভূত হয় এবং তরিতরকারী বিক্রয় দ্বারাই তাহারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। পরন্তু বড়

ফসল এবং ফল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া জমির খাজনা, মহাজনের দেনা প্রভৃতি শোধ করিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে কৃষকের চৈতন্য সঞ্চার হওয়া উচিত।

এই সকল অসঙ্গতির উপর রহিয়াছে দৈব দুর্বিপাক। কখন অনাবৃষ্টি, কখন অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারেও কৃষিকার্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের কৃষকদিগের পক্ষে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি উভয়ই সমান ক্ষতিকারক। যদি শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া সমবায় প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে উভয় প্রকার উৎপাৎ হইতেই শস্যাদি রক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত কোন এক গ্রামের অধিবাসীদিগের যোতে এক হাজার বিঘা জমি আছে। অনাবৃষ্টি বশতঃ সেই সকল জমিতে বীজ বপন করা সম্ভব হইতেছে না। সেরূপ ক্ষেত্রে দুই চারি জন গন্যমান্য ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এবং সমস্ত স্বার্থ-জড়িত লোকদিগকে ডাকাইয়া একটী সভা করিতে পারেন। সকলের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামীর জোত জমির অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হারে চাঁদা দিয়া একটী অর্থ ভাণ্ডার গঠন করিতে হইবে যাহাদ্বারা ঐ পরিমাণ জমিতে জল সেচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী পাম্পিং মেসিন্ ক্রয় করা যাইতে পারে এবং নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা উক্ত গ্রামের অনাবৃষ্টিজনিত

অসুবিধা ত দূর হয়ই, তাহা ছাড়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের শুষ্ক জমিগুলিতে জল সেচনের জন্য ভাড়া খাটাইয়া উক্ত মেসিনের মূল্য তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রথমে কিছু টাকা খরচ হয় বটে, কিন্তু উক্ত মেসিন্ হইতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশের বড় বড় জলাভূমিতে হাজার হাজার বিঘা জমি আছে। শত শত লোক উক্ত জমির মালিক। কোন দুই চারি জন লোকের পক্ষে উক্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের বাঁধ-বন্দি করিয়া ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে যদি কয়েক জন স্বার্থবান লোক উদ্যোগী হইয়া চাঁদা সংগ্রহ করতঃ উক্ত প্রকাণ্ড বিলের বাঁধবন্দি করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে প্রয়াস পান তাহা হইলে প্রচুর লাভবান হওয়া বিচিত্র নহে। বহু স্থানে ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অতএব কথিত প্রকারে জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া অনাবৃষ্টির হাত এড়ান অতি অসম্ভব নহে। ঐরূপে আট আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত ফসল সহজেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

উঁচু জমি অপেক্ষা নীচু জমিতেই অতিবৃষ্টির কুফল অধিকতর ভয়াবহ হইয়া থাকে কারণ, নীচু জমিতে বর্ষার জল জমিয়া উক্ত স্থানে ফসলের সমূহ ক্ষতি জন্মায়। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত নীচু জমিগুলিকে অতিবৃষ্টির প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা

উচিত। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করাই উহার একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু বিস্তৃত অঞ্চলের জল নিঃসরণ করা দুই চারি জনের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিলে ঐরূপ বৃহৎ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। যদি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্ম্মীরা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি হইতে সম্ভাবনীয় উৎপাতের আশঙ্কা করিয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতঃ জল নিকাশের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে ঐ সকল স্থানে শস্য উৎপন্ন করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। পৃথিবীতে বহু কৃষি প্রধান দেশে এই প্রকার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া এবং ঐ প্রকার উপদ্রব দমন করিয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাদৃশ উপায় অবলম্বিত হওয়া যেরূপ বাঞ্ছনীয় সেইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য কৃষকদিগের কোন বৃহৎ পরিচালক সমিতি (conducting body) নাই। তাহার ফলে এই হয় যে, ব্যবসায়ীরা কৃষকের নিকট হইতে এক টাকা মূল্যের জিনিষ কিনিয়া হয় ত চারি টাকায় বিক্রয় করে। সে ক্ষেত্রে কৃষকের অন্ততঃ দুই টাকাও পাওয়া উচিত। কিন্তু নিজেদের সে ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহাদের শ্রম উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হয় না। কে তাহাদিগকে বুঝাইবার ভার লইবে, কে

তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবে? আমাদের দেশের হাজার কৃষকের মধ্যে ৯৯৯ জন জানে না যে, ভারত সরকারের একটী পৃথক বিভাগ কৃষির উন্নতির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। সব সময় অর্থ সাহায্য পাইবার সুবিধা না হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিভাগের উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ কর্ম্মচারীবৃন্দ কৃষক-দিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য সতত প্রস্তুত রহিয়াছেন। পত্র লিখিলে ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ পাওয়া যায়। সময় বিশেষে উক্ত উপদেশ অত্যন্ত কার্য্যকরী এবং সুফলদায়ক হইয়া থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা কৃষিকার্য্য পরিচালিত এবং পরিলক্ষিত হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় সমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়া বহু প্রকার পরীক্ষা (experiment) চলিতে পারে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামীর ঘরে কৃষি বিষয়ক মাস-পঞ্জী থাকা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নে একটী ক্ষুদ্র পঞ্জী দেওয়া হইল।

(১) কাঁকরযুক্ত মাটীতে ডাল-কলাই ভাল জন্মে।

(২) বালুকাপ্রধান মাটীতে পটোল, চীনা বাদাম, গোল আলু, রাঙ্গা আলু, চুবড়ী আলু, মূলা, বীট্ প্রভৃতি ভাল জন্মে।

(৩) দো-আঁশ মাটীতে পাট, ইক্ষু, তামাক, কাপাশ, মূলা, কপি, বেগুণ, ডেঙ্গুডাঁটা, হলুদ লঙ্কা, আউশ ধান প্রভৃতি ফসল ভাল উৎপন্ন হয়।

(৪) কর্দ্দমময় জলা জমিতে আমন ধান, শোলাকচু প্রভৃতি জন্মে।

(৫) পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং পর্ব্বতগাত্রে চা ও কমলালেবুর গাছ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

যদি কোন কৃষক কাঁকর মাটীতে বেগুনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, অথবা বালিযুক্ত মাটীতে তামাক. ইক্ষু এবং দো-আঁশ মাটীতে আমন ধান রোপন করে তাহা হইলে, সে যে আট আনা ফসলও পাইবে না ইহা অতি নিশ্চিত। এইরূপে অনেক স্থলে কৃষকের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। ইহা ছাড়া যে সময়ে যে ফসল উৎপন্ন করা উচিত তাহা না করিয়া অনুপযুক্ত সময়ে করিলে তাহার ফলও আশানুরূপ হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অশিক্ষিত কৃষকগণ এতদূর পশ্চাৎ-পদ যে, নিজেরা কিছুতেই ঐ সকল বিষয় অনুধাবন করিতে পারে না। শিক্ষিত লোকের ঈঙ্গিত পাইলে বোধ হয়, ঐ সকল অনুপপত্তি থাকে না। প্রত্যেক কৃষক কৃষি সংক্রান্ত মাস-পঞ্জী অনুসারে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে তাহাতে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে।

প্রতি বৎসর একই জমিতে শস্য উৎপন্ন করিলে সেই জমির সার ভাগ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে সেই জমিতে ষোল আনা শস্য উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য জমিতে সার দিবার ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালা দেশে গোবরের সারই

উত্তম। তাহা ছাড়া পচা পাতার সার, হাড়ের গুঁড়া, ছাই, পুরাতন ঘরের মাটী, পোড়া মাটী, সোরা, সরিষার খৈল প্রভৃতি নানাবিধ সার বিশেষ বিশেষ চাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জমিতে সময় মত সার দেওয়া সম্বন্ধে অবহেলা করিলে তাহাতে ভাল শস্য ত হয়ই না বরং সময় সময় কৃষকের শ্রম ব্যর্থ হইয়া থাকে। অতএবচাষের জমিতে যাহাতে সময় মত উপযুক্ত সার দেওয়া হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

আদা ও হলুদের জন্য খৈল ও ছাই উত্তম সার। ঢ্যাড়সের পক্ষে গোবর ও পোড়া মাটী; মূলা, মিঠা কুমড়া ও লাউএর জন্য গোবর সার উত্তম; লঙ্কার জন্য খৈল এবং পুরাতন ঘরের মাটী এবং বেগুনের জন্য খৈল অথবা অল্প চূণ মিশ্রিত ছাই উত্তম সার। শাশর জন্য পুরাতন ঘরের মাটী অথবা রাবিশ উপযোগী। উচ্ছে, পটোল এবং কাঁকুড়ের জন্য পুরাতন খড় বা বাঁশের পাতা উত্তম সার। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, ওলকপি প্রভৃতির পক্ষে গোবর অথবা নাইট্রেট্ অব সোডা, ভাল সার।

———

# কৃষি-পঞ্জী

( সংক্ষিপ্ত )

বৈশাখে—অড়হর, শশা, ঝিঙ্গা, মিঠাকুমড়া, কাঁকরোল, ঢেঁড়স, উচ্ছে, বরবটী, চিনাবাদাম, ডেঙ্গু ডাঁটা, নটেশাক, হলুদ, আদা, মুখী কচু, মেটে আলু, পাট এবং আউস ধানের বীজ রোপন ও বপন করিতে হয়। এই মাসে ওল, কলার তেউড় এবং পানের লতা রোপন করিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে—আউস ধান, লাউ, কুমড়া, ঢ্যারস, ঝিঙ্গা, শসা, লঙ্কা, জল্দি, ফুলকপি, পাট, আউস মূলা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। ( মাসের প্রথমে জমিতে সার দিতে হয় ) পাকা কুমড়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখিলে বহুদিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

আষাঢ়ে—চারা প্রস্তুত করিবার জন্য নারিকেল ও শুপারী পোতা হয়। আম, লিচু, পেয়ারা, জামরুল প্রভৃতির কলম প্রস্তুত করিতে হয়। তামাক, মুগ কলাই ও লঙ্কার বীজ বপন এবং লাল আলুর লতা রোপন করিতে হয়। সিম, লঙ্কা, মুগ কলাই ও পালং বীজ বপন করা হয়।

শ্রাবণে—তামাক ও লঙ্কার চারা রোপন করিতে হয়; পুরাতন ( ফলের ) গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয় কারণ, গোড়ায় বৃষ্টির জল বসিলে গাছ সতেজ ও ফলবান হয়। এই মাসে টমেটো, শাঁক আলু, লাউ, পুঁই ও বরবটীর বীজ বপন করিতে হয়। এই মাসে আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতির কলম বসাইতে হয় এবং আনারসের চারা বসাইতে হয়।

ভাদ্র মাসে—কৃষ্ণতিল, সোনামুগ, ঠিক্‌রে কড়াই প্রভৃতির বীজ বপন ও বেগুন চারা এবং লাল আলুর লতা রোপন করিতে হয়। এই মাসে আউস ধান কাটা হয়। কোন কোন স্থানে ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ আরম্ভ হয়। এই মাসে নারিকেল ও শুপারীর চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

আশ্বিনে—গোল আলু, মুলা, কপি এবং সরিষা বীজ বপন করিতে হয়। বেগুন চারা ও তামাক চারা রোপন এবং সীম মটর, বরবটী, ও লাউ বীজ বপন করিতে হয়। এই মাসে খেজুর গাছের পাতা ফেলিয়া দিয়া কাণ্ডের কোমল অংশ বাহির করিতে হয়।

কার্ত্তিকে—যব, গম, সরিষা, করলা, তরমুজ, লাউ, খেঁসারী, মটর, মুগ, মশুরী, ছোলা এবং কোন কোন স্থানে গোল আলুর বীজ বপন করা হয়। পুরাতন গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হয়। এই মাসে পটোল মূলও বসান হয়।

অগ্রহায়নে—পটোলের মূল রোপন করিতে হয়। এই মাসের শেষে ইক্ষু কাটা আরম্ভ হয়। বেগুন, লঙ্কা, শশা, লাউ, উচ্ছে, কুমড়া প্রভৃতি যে সব ফল চৈত্র বৈশাখে পাওয়া দরকার সে সব বীজ এই মাসে বপন করিতে হয়। এই মাসে নদীর চরে তরমুজ বীজ বপন করিতে হয়।

পৌষ মাসে—আমন ধান কাটা আরম্ভ হয়। এই মাসের ইক্ষু গুড় এবং খর্জ্জুর গুড় বেশ দানাদার হয়। অগ্রহায়ন মাসে পুতিবার উপযোগী বীজগুলি এই মাসেও পোতা যায়।

মাঘ মাসে—এই মাসে ঘর ছাওয়া খড় কাটিতে হয়। অত্যন্ত শীত হয় বলিয়া এই মাসে নূতন বীজ পোতা হয় না বটে, তবে সময়ে জমিতে সার দিয়া জমি চষিয়া রাখিতে হয়। এই মাস আখের গোড়া পুতিবার উপযুক্ত সময়।

ফাল্গুনে—কাঁকুড়, আউস ঝিঙ্গা, উচ্ছে ও চাঁপা নটের বীজ বপন করিতে হয়। এই মাসে বাঁশের শুক্‌না পাতা পোড়াইয়া দিতে হয়।

চৈত্র মাসে—ইক্ষু রোপন করিতে হয়। এই সময় নারিকেল গাছ পরিষ্কার করাইলে গাছে প্রচুর ফল ধরে। হলুদ, আদা, লাউ, কুমড়া, শশা, ঢ্যাড়স, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ এই মাসে পুতিতে হয়। (ছায়া যুক্ত আওতা স্থানে আদা ভাল হয়; খৈল ও ছাই আদার উত্তম সার)।

# উদ্যান রচনা

আমাদের দেশে বহুলোক বাগানের ফল বিক্রয় করিয়া পাঁচ ছয় মাস, এমন কি বৎসরের অন্নও সংস্থান করিয়া থাকে। আম, কাঁটাল, নারিকেল, সুপারী, কলা, পেঁপে প্রভৃতি ফল বিক্রয় দ্বারা অধিক অর্থ উপার্জ্জিত হয়। জাম, জামরুল, পেয়ারা

আতা, আনারস, বেল, নানা জাতীয় লেবু, গোলাপ জাম প্রভৃতি বিক্রয় করিয়াও কিছু কিছু অর্থ রোজগার হয়।

যে সকল লোকের পক্ষে অন্যান্য গাছ প্রস্তুত করা অসুবিধা-জনক তাঁহারা আম, কাঁটাল, পেয়ারা, কলা, লেবু এবং পেঁপের গাছ রোপন করিলে বিনা . ঝঞ্ঝটে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন। যে সকল গৃহস্থ দূরদর্শী তাঁহারা ফলের বাগানের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। পরন্তু অদূর-দর্শীরা ঐ বিষয়ে উদাসীন। শেষোক্ত লোকেরা হয়ত সব কাজের সঙ্গে সঙ্গেই নগদ পয়সা চান। 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই নীতি কথা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। একটী সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিতে পারিলে যে বাঁধা আয়ের (fixed in-come) ব্যবস্থা হয় এ বিষয় তাঁহারা অবধারণ করিতে পারেন না। আমাদের দেশে যে সকল জমি পতিত দেখা যায় সেখানে আদর্শ বাগান প্রস্তুত করিলে অর্থাগমের উপায় হইতে পারে। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে ক্ষেতের কোনা বাণিজ্যের সোনার সমান। পতিত জমির সীমারেখার উপর বাব্‌লা, সেগুণ, সিমুল, প্রভৃতির চারা রোপন করিলে এক সময় বীমার চুক্তির (Insu-rance contract) মত এক কালে অধিক টাকা পাওয়া যায় অথচ প্রায় কিছুই খরচ হয় না। যত্নের সহিত যে কোন ফলের গাছ বা প্রয়োজনীয় গাছ প্রস্তুত করিলে তাহা অর্থপ্রসূ হয়ই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের

গৃহস্থেরা ফলের বাগানের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, যে বৃক্ষগুলি অর্থাগমের সাহায্য করে সে গুলির বিশেষ যত্ন না লইলে তাহারা অধিক দিন অর্থপ্রসূ থাকিবে না।

ফলের বাগানের উন্নতির জন্য দুইটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমতঃ গাছ বৃদ্ধ হইয়া আসিলে তাহার সন্নিকটে চারা গাছ রোপন করিতে হয়। সুতরাং যতদিনে ঐ গাছ মরিয়া যায় ততদিনে চারা গাছ বড় হইয়া ফলপ্রসূ হয়। দ্বিতীয়তঃ গাছগুলিকে সতেজ রাখিবার জন্য প্রতি-বৎসর বর্ষা কালে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে প্রত্যেকটীর গোড়ার চারিপার্শ্বে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে কিছু সার দিয়া রাখিত হয়। বর্ষার জলে গুলিয়া ঐ সার গাছের গোড়ায় বসিতে পারে। কার্ত্তিক মাস আসিলে উক্ত গর্ত্তগুলি মাটী দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে গাছ খুব সতেজ হয় এবং প্রচুর ফল ধারণ করে। নারিকেল গাছের গোড়ায় লবণ দিলে গাছে ফল ধরে। আম গাছের গোড়ায় ছাই, চূণ প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ দিলে ফল মিষ্ট হয়।

ফলের বাগান প্রস্তুত করা এবং পুকুরে মাছ জন্মান এই দুইটী বিষয় গৃহস্থ-পোষা ব্যবসা। এ বিষয়ে বাঙ্গালী গৃহস্থদিগের দৃষ্টি প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

---

# পশু পক্ষী পালন

পশুপক্ষী পালন দ্বারা কতকগুলি লোক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের ন্যায় পশুপালন কার্য্যও সংবৃদ্ধির পোষক। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, পশুপালন দ্বারা ধনী হইবার আশা করা যায় না। ( আমেরিকার অদ্বিতীয় ধনী রক্‌ফেলার প্রথম জীবনে পশু পালক ছিলেন )। তবে ইহা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের একটা পন্থা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকে পশুপালনের ভিতর দিয়া রক্‌ফেলারের ন্যায় জীবনের উচ্চতর উন্নতির সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিতে পারে।

পশুপালন সম্বন্ধে একটু বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রথমতঃ পশু পক্ষীদিগের খাদ্যাদির প্রতি যত্ন রাখিতে হয় এবং তাহাদের স্বাভাবিক গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে যাহাতে মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত না হইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি ঘটনাক্রমে কোন ব্যাধি সংক্রামিত হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কলিকাতা ও অন্যান্য সহরাঞ্চলে অনেক শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান পশুপক্ষীর গোলা ( poultry farm ) স্থাপন করিয়া

দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন। প্রত্যহ গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশুর দুধ এবং হাঁসও মুরগীর ডিম প্রচুর পরিমানে বিক্রয় হয়। দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও ঐ সকল জিনিষ চালান হইতে পরে। এই বিষয়টী অসংস্কৃত অবস্থায় থাকায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সুদৃষ্টিতে পড়িলে এ বিষয়ের সমধিক উন্নতি হইতে পারে এইরূপ আশা করা যায়। এই সকল ব্যাপারে এক জনের পরিবর্ত্তে দুই তিন জনের সহযোগিতায় কার্য্যের উন্নতি এবং সুশৃঙ্খলা হইবার অধিক সম্ভাবনা।

বর্ষা কালে পল্লী অঞ্চলে সাধারণ লোকের অর্থাগমের পথ সুগম থাকে না। সে সময় বহু দরিদ্র পরিবার গো-দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া দুই তিন মাসের অন্ন সংস্থান করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া বৎসরের সমস্ত ঋতুতে কিছু কিছু ঘৃত বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা রোজগার করে।

অবশ্য একথা সত্য যে, বহু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকাশ্য ভাবে পশুপক্ষী-পালন ব্যবসায় চালাইবার পথে বহু অন্তরায় আছে। সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা অন্যের সহযোগিতায় উক্ত ব্যবসায় চালাইতে পারেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে বহু ভদ্রসন্তান নিজ অর্থে কোন উপযুক্ত অথচ বাধ্য লোকের দ্বারা উক্ত ব্যবসায় চালাইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যান সাধন করিয়াছেন।

# মৎস্য-ব্যবসায়

মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের প্রথা আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নদীবহুল বাঙ্গালা দেশের জলে বিনা যত্নে প্রচুর মৎস্য জন্মে। সেই জন্যই মৎস্য বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য এবং চাল, ডাল, দুধ, সবজী প্রভৃতির ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয়। স্থূলতঃ দেখিতে গেলে, আমাদের দেশে, মাছের চাষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার বিশেষ প্রচলন নাই। বর্ত্তমানে কতকগুলি লোক এই দিকে মনোযোগী হইতেছেন। ষ্ট্যাটীষ্টিক্যাল হিসাব হইতে জানা যায় যে, মৎস্য ব্যবসায়ে শতকরা দুই শত টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ বিষয় আমরা অনেকেই সহজে ধারণা করিতে পারি না। ঐরূপ লাভ জনক ব্যবসায় বলিয়া কলিকাতা অঞ্চলে বহু ভদ্রসন্তান মৎস্য ব্যবসা করেন। প্রথমে একটী পুকুর জমা লইয়া তাঁহারা সময় মত তাহাতে মাছের পোনা বা ডিম ছাড়িয়া দেন। তারপর পোনা বড় হইলে তাঁহারা সেগুলি ক্রমে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। পোনা ছাড়িবার দুই মাস আড়াই মাস পর হইতে তাঁহারা বারমাসই মৎস্য বিক্রয় করিবার অবসর পান। যত দিন যায়, পোনা গুলি তত বড় হইতে থাকে।

পল্লী অঞ্চলে মৎস ব্যবসায় ঐ প্রকার লাভ জনক না হইলেও বহু লোক (ধীবর) উহার উপর নির্ভর করিয়া

জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ কাল আর বাঙ্গালার নদনদীতে পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, ঐ সকল জলাশয়ে কচুরী পানা জন্মিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিবার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। তাহার ফলে অনেক ধীবর জাত ব্যবসায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা মৎস্য-চালানী ব্যবসায় করিত তাহাদেরও অনেকের দুর্দ্দশা হইয়াছে। জলাশয়গুলির সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ফলোদয় হইতেছে না। পূর্ব্বোক্ত কারণে পল্লী অঞ্চলে মৎস্য-ব্যবসায়ের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা মৎস্য-ব্যবসায়ের সংস্কার বা উন্নতির বিষয় চিন্তা করেন না। তাহা ছাড়া মৎস্য-ব্যবসায় চালাইবার পক্ষে তাঁহাদের অনেক অন্তরায় আছে। পল্লী সমাজের জাত্যভিমান অন্যান্য ব্যবসায়ের বিঘ্নের মত এই ব্যবসায়েরও প্রতিবন্ধক। তবে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী না করিয়া নূতন প্রণালীতে মৎস্য-ব্যবসায় করিতে পারিলে তাঁহাদের দোষ খণ্ডন হইতে পারে। উক্ত ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া মৎস্যজীবিদিগের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। শিক্ষিত লোকের নির্দ্দেশ বা সাহায্য না পাইলে কখনও প্রাচীন ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশে পানাপূর্ণ, জলহীন, এবং অব্যবহার্য্য লক্ষ লক্ষ পুষ্করিণী ও দীঘি রহিয়াছে। সেগুলি জনসমাজের বিশেষ কাজে আসে না। যদি শিক্ষিত ও বেকার লোকেরা ঐগুলির সংস্কার করিয়া মাছের ডিম বা পোনা ছাড়িতে পারেন তাহা হইলে ঐ স্থানে বিস্তর টাকার মাছ জন্মিতে পারে। এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা আর্থিক অনটনের সুন্দর সমাধান হইতে পারে।

এই পরিকল্পনা সফল করিবার পক্ষে দুইটী বড় বিঘ্ন আছে। প্রথমতঃ জাত্যভিমানের দায়ে কেহ সহজে এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে চান না। দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ সংস্কারসাপেক্ষ বড় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা সর্ব্ব ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা সহজ নহে। শিক্ষিত লোকেরা আগ্রহান্বিত হইলে উভয় বিঘ্নই দূর করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন।

যে ক্ষেত্রে কোন এক জনের পক্ষে ঐ কাজ করা আপত্তি-জনক সেখানে কয়েক জন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। তাহা ছাড়া এই প্রচেষ্টা দ্বারা দ্বিতীয় বিঘ্নটীও দূরীভূত হইতে পারে কারণ, সংস্কারের জন্য যে পরিমাণ টাকা আবশ্যক তাহা এক জনের পক্ষে সরবরাহ করা দুর্ঘট হইলেও পাঁচ জন বা দশ জনের পক্ষে নহে। অধিক সংখ্যক লোকে মিশিয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে তাহাতে জাত্যভিমান বা কুলমর্য্যাদার হানি হয় না, কেননা—মিলে

মিসে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত দোষ খণ্ডিত হইয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন অথচ এইরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কথিত উপায় অবলম্বন করিলে নির্গোলে উক্ত ব্যবসায় দ্বারা লাভবান হইতে পারেন।

পুকুর সংস্কার করিয়া মাছ ছাড়িবার পর ন্যায্য চুক্তি অনুসারে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বা ধীবরকে পুকুর ইজারা দিলে সব গোল চুকিয়া যায়। মৎস্য ব্যবসায়েচ্ছু ব্যক্তির নিজ দখলে যদি কোন পুষ্করিণী না থাকে তাহা হইলে তিনি একাকী বা অন্যের সহযোগিতায় অন্য কোন ব্যক্তির অব্যবহার্য্য পুকুর দীর্ঘ কালের জন্য ইজারা লইতে পারেন অথবা পুকুরের মালিকের সঙ্গে সর্ত্ত স্থির করিয়া তাঁহাকে ঐ ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লইতে পারেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনার মধ্যে বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতির একটী প্রশস্ত পথ পড়িয়া রহিয়াছে

# কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে দু'একটী কথা

হস্ত দ্বারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করার নাম শিল্প। পূর্ব্বে আমাদের দেশে নানা প্রকার শিল্প প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ গৃহস্থদের ঘরে ঘরে শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া উহাকে

কুটীর-শিল্প বলা হয়। বিদেশ হইতে কলকারখানাপ্রসূত বহু জিনিষ আমদানী হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, এমন কি, কতকগুলি চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যখন এ দেশে শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ছিল তখন বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত গ্রামেই সর্ব্ব শ্রেণীর শিল্পীর বসতি ছিল। তাহাদের শ্রমপ্রসূত দ্রব্যাদির দ্বারা গ্রামবাসিদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব পূরণ হইত। তখনকার দিনে শিল্পীদের উপর গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিত। তাহাদের দৌলতে গ্রামগুলি আত্মনির্ভরশীল ছিল। এখনকার মত টাকাকড়ির তীব্র অভাব তখন অনুভব করিতে হইত না, কারণ, তখন শ্রমজাত দ্রব্যের অথবা শ্রমের বিনিময়ে পল্লী-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। কৃষক ধানের বিনিময়ে কাপড় লইত; তেলী তেলের বিনিময়ে ধান লইত; ধীবর মাছের বিনিময়ে দুগ্ধ লইত—এইরূপে সব জিনিষের বিনিময় চলিত। তখন টাকা পয়সার প্রচলন খুব কম ছিল। প্রাচীন কালে ক্ষেত্রজাত শস্যের নির্দ্দিষ্টাংশ দ্বারা রাজাকে কর পর্য্যন্ত দেওয়া হইত।

ব্রাহ্মণগণ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, পূজা, হোম এবং উপদেষ্টার কাজ করিতেন। রাজারাও বহু বিষয়ে ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৈদ্যগণ দেশীয় গাছ-গাছড়া প্রভৃতি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা অতি সামান্য ব্যয়ে, অনেক স্থলে

বিনা ব্যয়েও রোগ চিকিৎসা করিতেন। অতএব তখন রোগের চিকিৎসার জন্য গৃহস্থদের ব্যয়ভারজনিত আতঙ্ক উপস্থিত হইত না। কায়স্থগণ বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন। নানা শ্রেণীর শিল্পীগণ বিবিধ শিল্প-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতেন। কৃষকদিগের হাতে ফসল উৎপন্ন করিবার ভার ছিল। কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের হাত ছিল বণিকদের। এইরূপে ভারতীয় সমাজ-বিধানের গঠন হইয়াছিল।

কাল ক্রমে বৈদেশিক সভ্যতার প্রভাবে সমাজ বিধানের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার ফলে বিলাসিতা, মুদ্রার প্রচলনাধিক্য এবং বহুবিধ দুর্নীতি আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়াছে; গঞ্জ বাজার ও সহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; সর্ব্বত্র অল্পায়াসে যাওয়া আসার সুবিধা হইয়া ভালও হইয়াছে মন্দও হইয়াছে। বিদেশ হইতে কলকারখানাপ্রসূত নানাবিধ দ্রব্য অপ্রত্যাশিত ভাবে এদেশে আমদানী হইতেছে। সেগুলি এমনই চমকদপ্রদ যে, দেখিলে দর্শকের মনে নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। এক দিকে ক্রেতাদিগের বহির্মুখী প্রবৃত্তি অন্য দিকে বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা এই দুই কারণে আমাদের দেশীয় শিল্পের অভাবনীয় অধঃপতন হইয়াছে। বাঙ্গালীর রুচি পরিবর্ত্তনের ফলে দেশীয় শিল্পের অবনতি হওয়াতে বাঙ্গালী আজ অনুতপ্ত। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর

আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহাতে কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার ভিন্ন জাতীয় কল্যাণের প্রশস্ত পথ আর কিছুই নাই।

অগ্রগামী জাতিসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদেরই আদর্শে আমাদের দেশে নানা স্থানে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কলকারখানার অনেক প্রত্যক্ষ গুণ থাকিলেও পরোক্ষে অনেক দোষও আছে। এই বিষয়টী আধুনিক সভ্য জগতের একটী সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। কলকারখানার একটী প্রধান দোষ এই যে, এক একটী যন্ত্র শত শত শ্রমিক এবং শিল্পীর অন্ন মারিতেছে। তাহা ছাড়া সব কারখানার মালিকগণ শ্রমিক দিগের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কলকারখানার প্রসাদে ধনী শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা হয়, পরন্তু দরিদ্র শ্রমিকগণ খাটিয়া মরে। সুতরাং ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরোক্ষভাবে দেশের বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিক হইতে দেখিতে গেলে, উহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর কারণ, কুটীর শিল্প দ্বারা শত শত লোকে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহা এক এক জন কলওয়ালার ঘরে গিয়া মজুত হইতেছে। সেই জন্যই জাতীয় কল্যাণার্থে কুটীর শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত কুটীরশিল্পই জাপানী জাতির আর্থিক উন্নতির মূল।

কুটীরশিল্পের অধঃপতনে আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্প, বাসন-শিল্প, শঙ্খশিল্প, পাদুকাশিল্প, লৌহশিল্প প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শিল্পের অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। যে মৃতপ্রায় শিল্প এখনও রহিয়াছে তাহাতে দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নাই। পল্লীবাসীর সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাহার নিজের উন্নতি অবনতি শিল্পীদিগের উন্নতি অবনতির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। নিজে বাঁচিতে হইলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। পল্লীতে কেহ কাপড় প্রস্তুত করে, কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করে, কেহ সূত্রধরের কাজ করে, কেহ লোহা পিটিয়া শস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, কেহ বাসন, কেহ শাঁখা, কেহ বা মাদুর, পাটী, চুবড়ী, মোড়া ইত্যাদি প্রস্তুত করে। এক কথায় সমগ্র শিল্পীসমাজ একটী বিরাট যন্ত্রস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই যন্ত্রটী যত্নাভাবে আজ অচল হইবার উপক্রম করিয়াছে। এই যন্ত্রকে সচল এবং উন্নত করিবার ভার পল্লিবাসীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে শপথ করিতে হইবে যে, পারতপক্ষে তাঁহারা পল্লীর শিল্পী-দিগের জিনিষ উপেক্ষা করিয়া কলকারখানাপ্রসূত বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় ও ব্যবহার করিবেন না। তাঁহারা আরও মনে রাখিবেন যে বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা কাপুরুষের কার্য্য। সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, যখন যে জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে তখন সে নিজের জিনিষ ব্যবহার করাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কলকারখানার প্রসাদে মুষ্টিমেয় লোক অর্থশালী হয় এবং ধনিকত্বের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে দেশের মুষ্টিমেয় লোক সৌভাগ্যশালী হয় বটে কিন্তু দেশের অগণিত লোকের দুঃখদারিদ্র্যের কোন প্রতিকারই হয় না। উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন — "পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই আমাদের দেশের ন্যায় ধনবৈষম্য এত অধিক তীব্র নহে। এক দিকে মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের হস্তে ঐশ্বর্য্যের বিস্ময়কর সমাবেশ, অপরদিকে দেশব্যাপী ক্ষুধার আর্ত্তনাদ,—ইহা একমাত্র এদেশেই দেখা যায়।"

কুটীর-শিল্প বজায় থাকিলে উক্ত অর্থ দুই এক স্থানে পুঞ্জীভূত না হইয়া শত শত শিল্পীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার ফলে ধনিকত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং দেশের ব্যাপক ও সংক্রামক দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে কুটীর শিল্পের পুনরভ্যুদয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকৃষ্ট পথ নাই। ধনিকত্ব (Capitalism) সমাজের উপর কিরূপ নির্দ্দয় লীলা করিতেছে তাহা বেকার মাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছেন। যে অর্থের উপর সর্ব্বসাধারণের সুখ শান্তি নির্ভর করে তাহা ধনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Controlled) হইতেছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কুটীর-শিল্পের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। ঐ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা বলিয়াছেন— বর্ত্তমানে এই আন্তর্জ্জাতিক শোষণ ও

কলকারখানার যুগের অবসান না করিলে * * কোন দেশেই বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না।

পল্লী অঞ্চলে বহু শিল্প-কর্ম্ম নূতন ধরণে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার নানা স্থানে বস্ত্র, (রেশম, পশম ও সূতি) লৌহ, পিতল কাঁসা, কাঠ, বেত, বাঁশ, মৃত্তিকা, স্থাপত্য (গৃহনির্ম্মাণ), চিত্র, রজ্জু, মাদুর, পাটী, চাটাই, সম্মার্জ্জনী, নানাবিধ খেলনা, শয্যাদ্রব্য, অলঙ্কার, শাঁখা ও পাদুকা, সংক্রান্ত মৃতপ্রায় শিল্প প্রচলিত আছে। যদি ঐগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করা যায় এবং অল্প মূলধনে বাড়ীতে ছোট ছোট কল বসাইয়া বোতাম, দেশলাই, কালী, কলম, নিব, সূতা, পেরেক, কাতার দড়ি, চিনি, মিছরি, সাবান, সুগন্ধি তৈল (নারিকেল ও তিল তৈল), তরল আলতা, ফিতা, গেঞ্জী, মোজা, চিরুণী, ছাতা ইত্যাদি বহু প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে কুটীরশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা দুই শত হইতে চারি শত টাকা খাটাইয়া ঐ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে মাসিক শতকরা পঁচিশ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

যে সকল পল্লীতে কুটীর-শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে সে সকল স্থানে উন্নতির লক্ষণও দেখা যাইতেছে।

আমাদের সদাশয় গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের শিল্প-শিক্ষা

বিষয়ে উদাসীন নহেন। ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহারা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে কয়েকটী শিল্পবিদ্যালয় পরিচালন করিতেছেন। দেশীয় উদ্যোগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্যও তাঁহারা অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে ঘরে বসিয়া কুটীর-শিল্পের সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়।

Secretary Cottage Industries, Bengal.
Writers' Building, *Calcutta.*

# পল্লী সংস্কার

কুটীরশিল্প প্রসঙ্গে পল্লীগ্রামগুলির সংস্কারের কথা মনে উদিত হয় কারণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি পল্লী-বাসীর প্রধান উপজীবিকাগুলি পল্লীর সাধারণ অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে সহরবাসের আকাঙ্খা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তখন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিলে জীবিকা উপার্জ্জনের সুবিধা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সুবিধার

অভাব হওয়ার সাধারণ লোকের মধ্যে সহরবাসের আকাঙ্খা কমিয়া গিয়াছে। এখন বাধ্য হইয়া অনেককেই পল্লীমায়ের কোলে গিয়া আশ্রয় লইতে হইতেছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, জগতের অনান্য সমস্ত সভ্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন—Go back to village অর্থাৎ পল্লী গ্রামে ফিরিয়া যাও।

বঙ্গদেশের সমগ্র লোক সংখ্যার শতকরা পাঁচ ছয় জন সহরে বাস করে, অবশিষ্ট চুরানব্বই পঁচানব্বই জন লোক পল্লী-গ্রামে বাস করে। তাহা ছাড়া সহরবাসিদের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য চাল, ডাল, মাছ, শাক সবজী ইত্যাদি পল্লীগ্রাম হইতেই নিত্য সরবরাহ হয়। সুতরাং পল্লীগ্রামগুলির যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পল্লীগ্রামই সমাজের মেরুদণ্ড ও আধার। সেই জন্য আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র বলিয়াছেন—The Nation lives in the village অর্থাৎ পল্লীগ্রামই জাতির প্রকৃত বাসস্থান।

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা, পল্লীতে সুখে বাস করিবার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও, সেখানে বাস করা অপ্রীতি-কর মনে করেন। পল্লীতে বাস করিলে হয়ত তাঁহারা পল্লীর শ্রী ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন। পল্লীর অবস্থা উন্নয়নের প্রতি ঐরূপ ব্যক্তিদিগের মনোযোগ দিবার দিনও আসিয়াছে। তাঁহাদের মনে করা উচিত যে,

রবীন্দ্র নাথের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি বীরভূম জেলায় বোলপুর গ্রামে বৎসরের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে পারেন তবে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পল্লীবাস ত্যাগ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরাই বা ঐ আদর্শে চালিত হইব না কেন ?

ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য পল্লীগ্রামের আজ এই দুর্দ্দশা ! অধিকাংশ শিক্ষিত লোক সহরে বাস করায় পল্লী-সংরক্ষণের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি কমিয়া গিয়াছে। বহু পল্লী জঙ্গলাকীর্ণ এবং নানা রোগের আকর হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের যত্নে খনিত দীঘি ও পুকুরগুলি যত্নাভাবে হয়ত মজিয়া গিয়াছে নতুবা দাম, শেওলা, পানা, প্রভৃতি জন্মিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে ; এমন কি, নদীগুলিও কচুরী পানার হাত হইতে নিস্কৃতি পায় নাই। বাঙ্গলা দেশের সহস্র সহস্র পল্লীতে গ্রীষ্মকালে অবর্ণনীয় জলকষ্ট উপস্থিত হয়। অনেক স্থানে শুষ্কপ্রায় পুষ্করিণী হইতে ঘটি ডুবাইয়া পানীয় জল সংগ্রহ করাও দুস্কর হইয়া পড়ে। অসংখ্য পল্লীর পথঘাট অতি কদর্য্য। উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং বর্ষার সময় অব্যবহার্য্য হয়। সকল পল্লীতে শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই। এমন অনেক পল্লী আছে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চিকিৎসক পর্য্যন্ত নাই। সদালাপ, সৎসঙ্গ, সচ্চিন্তা প্রভৃতির অভাবে বহু পল্লীর অধিবাসীদের মনও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, পল্লীর ফলে জলে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত যুবকেরা কিছু কাল সহরে বাস করিলে, পল্লীর প্রতি ঔদাসীন্য, তাঁহাদিগকে সংক্রামক ব্যধির মত আক্রমণ করে। তাহাও পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ। এ বিষয়ে তাঁহাদের চৈতন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিছু দিন সহরে বাস করিয়া, পরে স্থায়ী ভাবে পল্লীতে বাস করিতে হইলে প্রথমতঃ একটু অসুবিধা বোধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু পল্লীবাসীরা ইচ্ছা করিলে সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা নিজেদের অনেক অসুবিধা সহজে দূর করিতে পারেন। যে সকল পল্লীতে সংস্কারের সাড়া পড়িয়াছে সে সকল স্থানে বাসেরও সুবিধা হইয়াছে।

যদিও কতকগুলি পল্লী সংস্কারের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা হইলেও বাঙ্গালা দেশের সহস্র সহস্র গ্রামে প্রণিধান-যোগ্য কোন সংস্কার এপর্য্যন্ত হয় নাই। ঐ সকল স্থানে ব্যাপক ভাবে সংস্কার কার্য্য চালান যে কত বড় ও কঠিন কাজ তাহা অনেকেই সহজে ধারণা করিতে পারেন না।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, (১) দেশের শাসক বৃন্দ, (২) জাতীয় মহাসভার সদস্য (৩) জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ্য, (৪) গ্রামের জমিদারবৃন্দ, (৫) সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, (৬) দেশের

ধনী বণিক সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অনেককেই, পল্লীর স্থায়ী অধিবাসীদের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পল্লীতে বাস করিতে হয় না। সুতরাং পল্লীসংস্কার বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা পল্লীবাসিদের স্বার্থ যে বহু গুণ অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব পরের মুখ চাহিয়া থাকা পল্লীবাসীদের পক্ষে যে কতদূত মূঢ়তাজ্ঞাপক সে বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

পল্লীর সংস্কারকল্পে সাহায্য করিতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক এইরূপ লোকদিগের নিকট হইতে পল্লীবাসীদিগকে নিজ প্রয়োজনের তাড়নায়, যথাসম্ভব সাহায্য আদায় করিয়া লইতে হইবে। কেহ স্বেচ্ছায় আসিয়া পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে সংস্কারের উপকরণ তুলিয়া দিয়া যাইবে না।

১। সরকার বলেন যে, তাঁহারা পল্লী-সংস্কারের মত বৃহৎ ব্যাপারে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ দিতে অক্ষম।

২। জাতীয় মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জ্জন না করিয়া তাঁহারা ঐ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন না।

৩। অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের পক্ষে, প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা দেখিবার কোন সুযোগ হয় না। সহস্র সহস্র নরনারীর সুখদুঃখের সহিত যে তাঁহাদের পাপ পুণ্য জড়িত আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা অনেকেই উদাসীন এবং অন্ধ। তাহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে উক্ত ঔদাসীন্যের ফলে এখন এমন

অবস্থা হইয়াছে যে, অন্যের বিষয় দূরে থাকুক, নিজেকে সামলানই কঠিন ব্যাপার।

৪। বোর্ডগুলি উক্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে অক্ষম, তবে তাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু টাকা খরচ করিতেছেন।

৫। সহরবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভাবপ্রবণ; সুতরাং তাঁহারা কাগজে কলমে, যা হোক করিয়া, মূল তথ্যগুলির (theories) সমাধান করিতে সিদ্ধহস্ত। পক্ষান্তরে পল্লীর শিক্ষিত ব্যক্তিরা হয়ত প্রতিবেশীদিগের সহিত মেলামেশার অভাবে, অথবা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে বিরক্ত হইয়া অনেক কাজ হইতে নিরস্ত হন।

৬। ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ পল্লীসংস্কার বিষয়ে উৎসাহী আছেন কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে পল্লীসংস্কার বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার লোকের অভাবে তাঁহাদিগের নিকট হইতে আশানুরূপ কাজ পাওয়া যায় না।

পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে বহু বিঘ্ন থাকিলেও অনেক স্থলে বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া হইতেছে। কিন্তু তাহাও মন্দের ভাল।

গ্রামের যুবকবৃন্দ উৎসাহী হইলে গ্রামের সংস্কার ও উন্নতি অনিবার্য্য। পল্লীগ্রামে শিক্ষক এবং চিকিৎসকেরা

সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন কারণ, তাঁহারা সকলের পিয়পাত্র। তাঁহারা প্রতি-বেশীদিগকে যেমন মৌখিক শিক্ষা দিবেন তেমনি নিজেরাও হাতে কাজ করিতে থাকিবেন। তাহার ফলে, বিস্তৃত ভাবে কাজ চলিবে এইরূপ মনে হয়। ঐ বিষয়ে চিকিৎকদিগের বিশেষ সুবিধা এই যে, তাঁহারা প্রত্যহ বহু লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পান। সেই অবসরে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতে পারেন। তাহা ছাড়া প্রাণের দায়ে গ্রামের সকলকেই তাঁহাদের নিকট আসিতে হয়। সুতরাং কেহই তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে না।

দলাদলি পল্লীজীবনের মস্ত অভিশাপ। পল্লীর কতকগুলি লোক স্কুল, ইউনিয়ন বোর্ড, কোন ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতি সাধারণ অনুষ্ঠানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব মনে করিয়া অযথা প্রভুত্ব করিতে চান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনান্য লোকের স্বার্থ তাঁহাদের অপেক্ষা একটুও কম নহে এবং অন্য লোকেরও ঐ বিষয়ে কথা বলিবার দাবী আছে। ঐরূপ প্রভুত্বাভিলাসী লোকদিগের মন্দ আচরণকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমতঃ মনো-মালিন্য ও পরে দলাদলি উৎপন্ন হইয়া দারুণ অশান্তি সৃষ্টি করে। ঐরূপ অন্ধ মাতব্বরদিগের সব সময় মনে রাখা উচিত, তাঁহারা সাধারণের সেবক মাত্র এবং সব সময় সাধারণকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। অতএব পল্লীর উন্নতির জন্য সর্ব্বাগ্রে

দলাদলির মূলে কুঠারাঘাত করা পল্লীসংস্কারকদিগের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

•

সকল গ্রামের জন্য পৃথক পৃথক কার্য্যসূচী স্থির করা কখন সম্ভবপর নহে। তবে, যে কার্য্য তালিকা সমস্ত গ্রামের পক্ষে প্রযোজ্য তাঁহা নিম্নে দেওয়া গেল—

( ১ ) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা,

( ২ ) রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ এবং সংরক্ষণ,

( ৩ ) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা,

( ৪ ) জঙ্গল পরিষ্কার ও খানা ডোবা ভরাট করা,

( ৫ ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন,

( ৬ ) নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা,

( ৭ ) নৈতিক উৎকর্ষের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা,

( ৮ ) বিলাসিতা বর্জ্জন এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবার জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা ও আদর্শ স্থাপন।

•

এই সকল উন্নতিমূলক পরিকল্পনাগুলি সফল করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে এক একটী সমিতিগঠন অপরিহার্য্য। সমিতিবদ্ধ হইলে প্রতিবেশীদিগের মধ্যে ঘনিষ্টরূপে ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হয় এবং গ্রামের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অনুকূলে কর্ম্মপ্রেরণা আসে।

গাঁতা

কোন কোন পল্লীগ্রামে দরিদ্র অথচ পরিশ্রমী ও স্বাবলম্বী গৃহস্থদিগের মধ্যে গাঁতা বা গাঁওতা ( গ্রাম্যতা ) অর্থাৎ পরস্পর সহানুভূতিমূলক শ্রমবিনিময় প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রথা অতি উত্তম এবং সাধু উদ্দেশ্য-ব্যঞ্জক। প্রতিবেশীদিগের মধ্য হইতে ৭।৮ জন গৃহস্থ যাহাদিগকে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা নিজ নিজ গৃহকর্ম্ম ও ক্ষেত্রাদির কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয় তাহারা সকলে এক জনের কাজ করিয়া দিবার জন্য এক দিন মিলিত হয়। সাত আট জন একত্র যোগে কাজ করায় এক জনের কাজ অতি সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়। পর দিন হয়ত অপর এক জনের কাজ করিয়া দিতে এবং তৎপর দিন হয়ত তৃতীয় লোকের কাজ করিয়া দিতে উক্ত লোকগুলি মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এইরূপে পালাক্রমে, সকলেরই কাজ সহজে ও সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া যায়।

এই প্রথার অর্থনৈতিক মূল্য খুব কম নহে, কারণ, আট জন কৃষাণ লইয়া উক্ত কাজ করিতে হইলে এক কালে যে টাকা খরচ হইত তাহা বাঁচিয়া যায়, অথচ কৃষাণের কাজ অপেক্ষা কাজ ভাল হয়।

সমাজনৈতিক হিসাবেও এই প্রথার মূল্য যথেষ্ট, কারণ ইহা দ্বারা মেলামেশার সুযোগে পল্লীবাসীদিগের সঙ্কীর্ণতা দূর

হইয়া উদারতা বৃদ্ধি পায়। বাঙ্গলা দেশের যে সকল অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত নাই সেই সকল অঞ্চলে ইহার প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কোন কোন স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা এবং আচরণ দ্বারা গ্রামবাসীদের কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করা হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান গঠিত ও সংরক্ষিত করিবার জন্য গ্রামের অধিবাসী এবং প্রবাসী উভয়েরই সমান আগ্রহ থাকা উচিত।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে থাকিলেও তাঁহাদের পরিবারবর্গ গ্রামে বাস করেন। অতএব গ্রামের প্রতি তাঁহাদের নজর রাখিতেই হয়। গ্রামের উন্নতিকল্পে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একটী সমিতি গঠিত হইলে গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে সামান্য সামান্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটী ধনভাণ্ডার খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। অবশ্য কতকগুলি কাজ গ্রামবাসীদের সমবেত পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইলেও অন্য অনেক কার্য্যে অর্থব্যয় আবশ্যক। সেই জন্য একটী ধনভাণ্ডারের প্রয়োজন হয়।

উপজীবিকার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সহরে নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির যেরূপ সংক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে স্বাস্থ্যের জন্য, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, পল্লীতে যাইয়া

অনেককে বাস করিতে হইবে। কিন্তু পল্লীতে বাস করিলে এক একটী উপজীবিকা ত চাই।

১। কৃষি ২। শিল্প ৩। বাণিজ্য ( চালানী কাজ বা দোকানদারী ) ৪। শিক্ষকতা ৫। চিকিৎসা ব্যবসায় ৬। পৌরহিত্য ৭। জমিদারী ও তালুকদারী ৮। তহশীলদারী ৯। দালালী ১০। মজুরী ১১। তেজারতি মহাজনী ১২। উদ্যান রচনা ১৩। পশুপালন ১৪। মৎস্য ব্যবসা

এইগুলিই পল্লীবাসিদের উপজীবিকার পথ। সকলের পক্ষে উহার সবগুলি অনুকূল এবং উপযুক্ত হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ মার্জ্জিত বুদ্ধির বলে নূতন নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত ( field create ) করিতে পারিবেন কারণ, পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক কুটীর শিল্পের উপযোগী বিষয় আছে যাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না (৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলা দরকার যে পল্লীবাসীদিগকে পল্লীতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যাঁহারা পল্লীতে বাস করিতে তেমন ইচ্ছুক নহেন তাঁহাদিগের জানা দরকার —

## সহর ও পল্লীবাসের প্রভেদ কত

কোন সময়ে একটী ছাত্র তাহার গুরু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—সহর ভাল, না পাড়াগাঁ ভাল। গুরু মহাশয় তখন

ছাত্রটীকে প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন—উদর ভাল, না মস্তক ভাল। গুরু মহাশয়ের প্রশ্ন হইতে বুঝা যায়, ঐ বিষয়ের প্রকৃত উত্তর দেওয়া কত কঠিন। এখানেও আমরা ঐ দুইটী বিষয়ের কোনটী ভাল কোনটী মন্দ তাহা বিচার না করিয়া উহাদের সুবিধা অসুবিধাগুলি আলোচনা করিতে পারি। সহরবাসীরা বহু বিষয়ে পল্লীগ্রামের অধিবাসী অপেক্ষা সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। সহরের পথগুলি পাকা, সেই জন্য জল কাদাতে আদৌ দুর্গম হইতে পারে না। রাত্রিকালে সহরের রাস্তায় আলো জ্বলে, তাহাতে সাপের বা অন্য হিংস্র প্রাণীর ভয় না করিয়া পথে চলা যায়। সহরে নানাবিধ যান বাহন চলে বলিয়া যাতায়াতের সুবিধা আছে। আমোদ প্রমোদের জন্য সহরে বহু প্রতিষ্ঠান আছে। সহরে বড় বড় দোকান আছে, সুতরাং যখন যাহা ইচ্ছা কিনিতে পারা যায়। সেখানে চোর ডাকাতের উপদ্রব নাই বলিলেই চলে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সহরে মিউনিসিপ্যালিটী থাকায় কোন দিন জলকষ্ট উপস্থিত হয় না। ভাল ভাল চিকিৎসক থাকায় সুচিকিৎসার অভাব হয় না। এই সকল সুবিধার জন্য কতক গুলি লোক সহরে আকৃষ্ট হয়। বড় বড় সহরের প্রধান দোষ এই যে, সেখানে অকৃত্রিম খাদ্যাদি কম মিলে। তাহা ছাড়া চারি দিকে বহু বাড়ী ও কলকারখানা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্য সহরে বহু লোক বাস করে বলিয়া সহরের বায়ু সব

সময় বিশুদ্ধ থাকে না। সহরের বহু বিষয়ে কৃত্রিমতা পরিস্ফুট দেখা যায়। কিন্তু প্রাণ চায় প্রকৃতিকে।

পল্লীতে প্রকৃতির পূর্ণ স্বরূপ বিরাজমান। পল্লী অঞ্চলের বায়ু নির্ম্মল ও পবিত্র। দেশ জুড়িয়া সূর্য্যকিরণ ও চন্দ্রালোক খেলা করে; গাছে গাছে পাখী গান গায়, বনে বনে ফুল ফোটে, মাঠ জুড়িয়া শস্য ক্ষেত্র শোভা পায়। টাট্‌কা মাছ, দুধ ও তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জীবন যাপনে কৃত্রিমতা না থাকায় মনে প্রফুল্লতা থাকে। অনেক পল্লীতে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। পাড়াগাঁয়ের প্রধান দোষ সংস্কারাভাব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্য।

পল্লীগ্রাম সংস্কৃত হইলে সেখানে বাস করা সহরে বাস করা অপেক্ষা কোন অংশে কম সুখের হইতে পারে না। পল্লীর মুক্ত বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া সহরবাসীর অসুখ হইলে, চিকিৎসকেরা তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পল্লী অঞ্চলে গিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

## দালালী

প্রায় সমস্ত জিনিষের ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে এক দল সংযোজক থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া

জিনিষ বিক্রয় করাইয়া দেওয়া সংযোজকদিগের কার্য্য। এই শ্রেণীর লোকদিগকে দালাল ( Broker or salesman ) বলা হয়। কেহ কেহ দালালী করিয়া ক্রোরপতি হইয়াছেন। নিজেরা প্রত্যক্ষ ভাবে কোন ব্যবসায় না করিলেও তাঁহারা যখন ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে জড়িত তখন তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই দালালী কার্য্য চলিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন জিনিষের দালালেরা সকলেই অল্প বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে সততা বজায় রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায়। দালালদিগকে নিজ নিজ দায়িত্ব জ্ঞানের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। অকাতরে পরিশ্রম করিতে না পারিলে এই কার্য্যে উন্নতি লাভ করা যায় না। ধৈর্য্যহীন হইলে ও এই কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয় না।

যিনি যে জিনিষের দালাল তাঁহাকে সেই সম্বন্ধে অনেক সন্ধান রাখিতে হয়। তাহা না করিলে, ভাল ভাবে কাজ করিবার সুবিধা হয় না। অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের ন্যায় ইহাতেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সহরাঞ্চলে এই কার্য্য বিস্তৃত ভাবে চলে। পল্লীগ্রামেও সংকীর্ণ ভাবে দালালী কার্য্য চলে।

যাঁহাদের অর্থ পুঁজি নাই, অথচ চাকুরী না করিয়া নিজ পরিশ্রম দ্বারা স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক এইরূপ লোকদিগের পক্ষে এই পথ প্রশস্ত। বিশ্বাস ও পরিশ্রম এই

কার্য্যের মূলধন স্বরূপ। উক্ত দুইটী বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকিয়া যিনি যত কাজ করিতে পারেন তাঁহার তত উন্নতি হয়। দালালী করিয়া অনেকে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করিয়া থাকেন। সহরাঞ্চলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দালালীর সুবিধা আছে—

১। বাড়ী ও জমি বিক্রয়.

২। ষ্টীমার, মোটরগাড়ী, ছাপাখানা, মিল ও অনান্য কল কব্জাদি বিক্রয়.

৩। জীবনবীমা, ( ইহা পল্লী অঞ্চলেও চলে )।

৪। নানা প্রকার মসলাদি বিক্রয়,

৫। চাল, ডাল, লবণ, তৈল, গুড়, চিনি, ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য,

৬। চা, পাট, তামাক, পাথুরিয়া কয়লা, ইত্যাদি,

৭। রেশমী, পশমী, সূতি প্রভৃতি কাপড় বিক্রয়,

৮। লৌহ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য নির্ম্মিত জিনিষ বিক্রয়,

৯। ঔষধ ও ডাক্তারি যন্ত্রাদি,

১০। বাদ্যযন্ত্রাদি ও সঙ্গীত সরঞ্জাম,

১১। নানা প্রকার কাঁচা মাল ও ভুষিমাল বিক্রয় ইত্যাদি।

———

# সংস্কার শিল্প

( মেরামতি কাজ )

বেশী টাকা না খাটাইয়া অথবা মোটেই টাকা না খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার যে সকল সাধু পথ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কার-শিল্প তাহাদের অন্যতম। প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রাদি যোগাড় করিয়া তাহার সহিত কায়িক পরিশ্রম সংযুক্ত করিতে পারিলেই অনেকে সাধুভাবে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পারেন। মেরামতি কাজ দ্বারা সমাজের বহু লোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়। অর্থের সংস্থান নাই অথচ কার্য্যে দক্ষতা আছে এইরূপ লোকের পক্ষে মেরামতি কাজই প্রশস্ত।

অন্যান্য অনেক কাজের মত এই কাজেও প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। এমন অনেক মেরামত ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা নিজের অধীনে একাধিক বেতনভোগী লোক রাখিয়াও কাজ চালাইয়া থাকেন।

সহরই মেরামতি কাজের প্রশস্ত ক্ষেত্র। সেখানে বাড়ী, মোটরগাড়ী, সাইকেল, ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, ষ্টোভ, নিত্য ব্যবহার্য্য বাসন ও আসবাবপত্র প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষের

মেরামত কার্য্য হইয়া থাকে। এখনও ঐ কার্য্যের যথেষ্ট প্রসার হইতে পারে। পল্লীগ্রামের মেরামত ব্যবসায়ীগণ অনেক সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। পল্লীগ্রামের অনেককে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের নূতন পথ দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

## জমিদারী

বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক জেলায় হাজার হাজার ছোট বড় জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার, হাওলাদার বা পত্তনীদার প্রভৃতি আছেন। তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তি হইতে লব্ধ অর্থ দ্বারা বহু পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। জমিদারী ব্যবসায় অর্থাগমের একটী প্রকৃষ্ট পন্থা; তাহা উল্লেখ করা অধিকন্তু।

যাঁহারা বড় জমিদার তাঁহারা বহু প্রকারে সমাজ সেবা করিয়াছেন এবং এখনও কেহ কেহ করিতেছেন এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু নিজ নিজ সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তাহার সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা যে

স্বত্তাধিকারিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা অনেকেই বিস্মৃত হন এবং ঐ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। তাহার ফল অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদারদিগের সন্তানেরা সম্পত্তি পরিচালন সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা ( training ) পান না। তাঁহাদের অনেকেই নিষ্কর্ম্ম জীবনে বীতশ্রদ্ধ হন এবং 'ঘরের ভাত খাইয়া বনের মহিষ কিলাইয়া' থাকেন. এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক দোষ গুণ বিচার করা সম্ভব নহে। তবে সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে, জমিদারী পরিচালন বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ত্রুটী।

ঐ ত্রুটীর জন্য তাঁহাদের অনেকেই কর্ম্মচারীদিগের মায়াব্যূহ ভেদ করিতে পারেন না। দূরে কি হইতেছে, অনেক সময় তাহার প্রকৃত সংবাদ তাঁহাদিগকে না দিয়া এবং অনেক কর্ম্মচারী, বিপরীত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া মনিবদিগের কর্ম্মশৈথিল্যের সুযোগ লইয়া থাকেন। কাজেই প্রকৃত অবস্থা যতটা ভাল অথবা খারাপ হউক না কেন, সব সময়ে তাহা তাঁহাদের গোচরীভূত হয় না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন কার্য্য-প্রণালীও দুরবস্থা আনয়ন করিতে সাহায্য করে।

আজ যে দারুণ অর্থসংঙ্কটে বাঙ্গালার অসংখ্য জমিদার প্রপীড়িত তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মূলে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক— এই মারাত্মক নীতি লুক্কাইত রহিয়াছে। তাহার অব্যবহিত ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, আবশ্যক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ঋণ গ্রহন করিতে হয়। গরীবেরা যেমন দশে দশে, কুড়িতে কুড়িতে টাকা ধার করে ধনী শ্রেণী তেমনি হাজারে হাজারে এমন কি লাখে লাখে টাকা ধার করিয়া নাক্ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যান। অতএব অর্থরূপ শক্তির অভাবে স্বীয় জমিদারী ব্যবসায় উন্নত করা অনেকের পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পরো-পকার করা দূরের কথা, নিজের অবস্থা বজায় রাখাও তাঁহাদের অনেকের পক্ষে এখন কষ্টকর হইতেছে।

বাঙ্গালার জমিদারবর্গের বাৎসরিক আদায়ী করের পরিমাণ চৌদ্দ কোটী টাকা, তাহা হইতে সরকারকে চার কোটী টাকা মাত্র কর (রেভিনিউ) দিতে হয়। সুতরাং কাগজপত্রের হিসাব অনুযায়ী তাঁহাদের মোট মুনফা যে দশ কোটী টাকা থাকে তাহা হইতে কতক টাকা সরঞ্জামী বাবদে খরচ হয়। অতএব প্রতি বৎসর তাঁহাদের যথেষ্ট টাকা থাকিবার কথা। তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গলার জমিদারদিগের অবস্থা যে কেন দিন দিন এরূপ শোচনীয় হইতেছে তাহা বাস্তবিক ভাবিবার

বিষয় কারণ, তাঁহাদের অবস্থার সহিত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রহিয়াছে।

জমিদারদিগের অনেকের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিলে এই কথা মনে হয় যে, জমিদারী পরিচালনার কঠোর দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই যথাযথ শিক্ষা ( training ) লাভ করেন না বলিয়াই তাঁহদের ঐরূপ অবস্থা হয়। তাহা ছাড়া বিবেচনা না করিয়া পৈত্রিক সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় করাও যে অনেকের এইরূপ শোচনীয় পরিণামের একটী প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঐ প্রকারে নিজ নিজ শক্তি ক্ষুন্ন করিয়া কেহ কেহ এত অধীর হইয়া পড়েন যে, নিজ ব্য...য় ( জমিদারী পরিচালন ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া অন্যান্য ...ষয়ে ( যেমন কলকারখানা নির্ম্মাণ ইত্যাদি ) মনোযোগ দিয়া অবিলম্বে অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর করিতে প্রয়াসী হন, কি... তাহার ফলে—

যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিসেবতে,
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবং নষ্টমেব হি।

এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। He gets into the fire out of the frying pan.

অবশ্য তাঁহাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় অবগত না হইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায় না। তবে

সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতি হানিজনক হয়। They should look before they leap. অর্থাৎ ঐরূপ আয়ত্তবহির্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত। No risk no gain, একথা সত্য, তাই বলিয়া কোন কার্য্য-প্রণালী মন্দ হইলে সেটীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

এই দুর্দ্দিনে এমন অনেক জমিদার এদেশে আছেন যাঁহারা বরাবরই সুশৃঙ্খলার সহিত বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। আয়ব্যয়ের দিকে তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাঁহারা এখনও সংক্রামক অর্থকৃচ্ছ্রতার কবলে পতিত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত কম যে, করাগ্রে গণনা করা যায়। অধিকাংশ জমিদারই আজ দুর্দ্দশাপন্ন। জগতব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতা তাহার জন্য আংশিক দায়ী, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে।

যাঁহারা ভবিষ্যতের অর্থাগমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারাই প্রতারিত হইয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে। আচরণাদির বৈষম্যেও বহু ক্ষতির কারণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'সাধ্যানুসারে মানুষের দুঃখ দূর করিব, পরের উপকার করিব,' তাঁহাদের যদি এইরূপ ধারণা জন্মে এবং অন্নহীনকে অন্ন দিবার জন্য, আতুরকে সাহায্য করিবার জন্য ভগবান আমার হাতে প্রচুর শক্তি দিয়াছেন। আমি তাহার প্রকৃত

সদ্ব্যবহার না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে—এইরূপ চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত থাকিলে সম্পত্তিবানদিগের নিজেদের এবং তাঁহাদের আশ্রিতদিগের কল্যান সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শোষণ বৃত্তি যদি মূলীভুত নীতি হয় তাহা হইলে তাহার ফলও প্রীতিকর হইবে না। আত্ম-বিচ্ছেদ, গৃহবিবাদ, কপটতা প্রভৃতি দোষেও বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার সময় সময় দুষিত হয়।

পরের দ্বারা কাজ না করাইলে জমিদারী রাখা যায় না ইহা সত্য, তাই বলিয়া তাঁহাদের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করা উচিত নহে। নিজেরও যথেষ্ট কাজ করিবার আছে ইহা মনে করিতে হয়। পূর্ব্বে জমিদারেরা যেমন কথায় ও কাজে দেখাইয়া দিতেন যে তাঁহারা প্রজাদিগের মা বাপ, এখনকার জমিদারগণও সেইরূপ দেখাইয়া দিন। তাহা হইলে ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসায়ের পুনরভ্যুদয় হইবে।

## মহ

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে মহাজনী কারবার চলিয়া আসিতেছে। উহা দ্বারা বহু পরিবারের

অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বেও উক্ত ব্যবসায় যেরূপ সুবিধাজনক ছিল বর্ত্তমানে তেমন নাই। এই জন্য অনেককে বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ে টাকা খাটাইতে হইতেছে।

সাধারণতঃ তুইটী কারণে মহাজনী ব্যবসায় নষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ মহাজনদিগের অতিশয় শোষণ, দ্বিতীয়তঃ অতিশয় অবহেলা বা উদাসীনতা। এক শ্রেণীর মহাজন আছেন যাঁহারা খাতকের নিকট হইতে বার্ষিক শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত সুদ আদায় করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। যদি খাতকের টাকা শোধ করিতে তুই এক বৎসর বিলম্ব হয় তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর মহাজনকে এক শত টাকার জন্য চারি শত টাকা দিয়াও সে অব্যাহতি পায় না। এই শ্রেণীর মহাজনদিগের নিকট সুদের কোন নির্দ্দিষ্ট হার নাই। চরম মাত্রায় শোষণ করাই তাহাদের ধর্ম্ম।

টাকার অনিবার্য্য প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই সকল অমানুষিক ব্যাপার উপেক্ষা করিয়াও খাতক মহাজনের দ্বারস্থ হয় এবং মহাজনের সকল সর্ত্ত মানিয়া লইয়া টাকা ধার করে। ন্যায়ের দিক হইতে দেখিতে গেলে, উক্ত শ্রেণীর মহাজনগণ যে যথেষ্ট পাপ সঞ্চয় করে তাহাতে সন্দেহ নাই। শেষে ঐ প্রকার তুর্ব্যবহার শত্রুতায় পরিণত হয়। তাহাদের ঐ জাতীয় শোষণের হাত এড়াইবার জন্য অনেক স্থলে খাতকেরা ব্যাঙ্ক

তে টাকা লইয়া থাকে কারণ, ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত সুদ লইতে পারে না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে সর্ব্বত্র ব্যাঙ্ক না থাকাতে পল্লীগ্রামে খাতকদিগের অসুবিধা ছিল। দরিদ্র কৃষকদিগকে মহাজনের নির্ম্মম কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য Co-operative credit society বা সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হওয়ায় কৃষকদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা ব্যাপক ভাবে কাজ না হওয়ায় বহু খাতককে এখনও মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট মহাজনের শোষণ বন্ধ করিবার জন্য নূতন আইন প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর মহাজন দিগের এখনও সতর্ক হওয়া উচিত। তাঁহারা যদি অল্প সুদে টাকা ধার দেন তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবসায় এখনও চলিতে পারে এবং খাতক ও মহাজনের মধ্যে শত্রুতার সম্ভাবনাও কম হইতে পারে।

আর এক শ্রেণীর মহাজন আছেন। তাঁহারা অতি সরল প্রকৃতির। টাকা হাতে থাকিলে খাতকের অবস্থার দিকে না চাহিয়াই তাহাকে টাকা ধার দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস এত অধিক যে টাকার ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া তাঁহারা তহবিল নিঃশেষ করিয়া টাকা ধার দেন, ঘরে কতকগুলি খত পত্র পড়িয়া থাকে মাত্র। তাহার ফলে, মোকদ্দমা করিয়া টাকা আদায় করিবার সঙ্গতিও

অনেকের থাকে না। নিজে মহাজন হইয়াও ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য হইয়া নিজেকে অপরের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়।

এইরূপ অবস্থা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে, যে টাকা সুদে খাটান হয়, তাহার সিকি টাকা সর্ব্বদা তহবিলে মজুত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া স্থান বিশেষে শুধু খতের দ্বারা টাকা ধার না দিয়া, জমি কিম্বা অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া উচিত। ব্যবসায় হিসাবে মহাজনী কাজ চালাইতে হইলে সুদের হার নির্দ্দিষ্ট ও যথাসম্ভব কম করিয়া দিলে এখনও উক্ত ব্যবসা সচল এবং উন্নত হইতে পারে।

## কণ্ট্র্যাক্টরী বা ঠিকাদারী কাজ

ঠিকাদারী স্বাধীন ব্যবসা। বহু লোক ঠিকাদারী করিয়া নিজ নিজ আর্থিক অবস্থার সমধিক উন্নতি করিয়াছেন। বড় রকমের ঠিকাদারী করিতে হইলে প্রচুর মূলধনের

প্রয়োজন হয় কিন্তু ছোট রকমের ঠিকাদারী করিতে গেলে অল্প মূলধনে কাজ করিতে পারা যায়।

একটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। অনান্য ব্যবসায়ের ন্যায় ইহাতেও প্রাথমিক শিক্ষালাভের দরকার হয়। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রথমে একজন বড় ঠিকাদারের সহিত থাকিয়া কাজ শেখা উচিত। শিক্ষা লাভ না করিয়া ঠিকাদারী করিতে গেলে অনেক সময় লাভ করা দূরে থাকুক বরং ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়।

দালালী প্রভৃতি কাজের মত ঠিকাদারী কাজেও বিশেষ পরিশ্রম এবং ধৈর্য্যের দরকার। বিনা আয়াসে এই কাজে উন্নতি লাভ করা যায় না। সহর অঞ্চলে বাড়ী নির্ম্মাণ, ও মেরামত, রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত, কুপ খনন, খাল খনন, কলকারখানা নির্ম্মাণ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কার্য্যাদি, রেলওয়ে সংক্রান্ত কাজ, সরকারের কাজ প্রভৃতি বড় বড় ঠিকাদারেরা লইয়া থাকেন। কোন ভোজের খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করা প্রেসের কাজ সংগ্রহ করা, প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা, কোন ফার্ম্মের জন্য পোষাক, কালী কলম, কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি সরবরাহ করা, মেস, বোর্ডিং হাউস, হোষ্টেল অথবা ধনীলোকের বাড়ীতে নানাবিধ জিনিষ সরবরাহ করা ইত্যাদি বহু কাজ ছোট ছোট ঠিকাদারগণ

লইয়া থাকেন। এই কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রমের দরকার সেইরূপ বিশ্বাসেরও দরকার। অবিশ্বাসের কাজ করিলে এই বিষয়ে সুবিধা করা যায় না। সহরাঞ্চলেই ঠিকাদারী কাজ ভালভাবে চলে। পল্লী অঞ্চলেও সামান্য সামান্য ঠিকাদারী কাজ হইয়া থাকে।

## চাকরী

সমাজের নানা শ্রেণীর লোকদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির (জীবিকা) নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, * * * * ন শ্ববৃত্তি কদাচন। উহার মর্ম্ম এইরূপ.—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সকল ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন বৃত্তির ব্যবস্থা আছে কিন্তু শ্ববৃত্তি (কুকুরের বৃত্তি) অর্থাৎ চাকরী গ্রহণ করিবার বিধান নাই, বরং নিষেধ আছে। কিন্তু সে দিন চলিয়া গিয়াছে। কালের চক্র ঘুরিয়া গিয়াছে বলিয়া তখন যে সকল বিষয় বর্জ্জনীয় ছিল এখন সেগুলি সাধনার বিষয় হইয়াছে।

বিষয়টী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, শাস্ত্রকারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। যিনি যত বড় চাকরে হউন

না কেন, তাঁহাকে উপরিতন কর্ম্মচারীর ভয় অল্প বিস্তর রাখিতেই হয়। যাঁহারা অল্প বেতনে চাকরী করেন তাঁহাদের ত কথাই নাই। তাঁহাদের কেহ বড়বাবুকে জুজুর মত দেখেন, আবার কেহ বা ইষ্ট দেবের ন্যায় মনে করেন। উপরিওয়ালাও মানুষ নীচুওয়ালাও মানুষ— হয়ত বা অধিক গুণশালী কিন্তু মর্য্যাদা, মনুষ্যত্ব, গুণ, বিদ্যা প্রভৃতি সমবেত সব কিছুর একটী বিরাট পরিহাস চাকরীস্থলে ব্যতীত জীবনের অন্য কোথাও দেখা যায় না।

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে আমাদের দেশে চাকরীর মোহ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ইং ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরের উৎপত্তি হইবার তিন চার বৎসর পরে বিদেশীয় বণিকেরা কলিকাতায় সওদাগারী আফিস খুলিলেন। তাঁহাদের ব্যবসায় পরিচালন করিবার জন্য এদেশীয় লোকদিগের সাহায্য লইতে হইল। সে সময় অতি সামান্য ইংরাজী শিখিলেই সাহেবদের আফিসে চাকুরী জুটিত। সুতরাং দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনও অধিক হইল। ক্রমশঃ সহরাঞ্চলে জনস্রোত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহা ছাড়া অল্পায়াসে কিছু অর্থ রোজগার হইত বলিয়া সাধারণতঃ চাকরী-ওয়ালারা একটু নিশ্চিন্ত ভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে পারিতেন।

এই স্বচ্ছন্দ ভাবের জন্যই অধিকাংশ লোক চাকুরীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে

উক্ত দাস মনোবৃত্তি, স্বাধীন মনোবৃত্তিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন চাকরীর বাজারে অত্যন্ত মন্দা দেখা দিয়াছে।

বাঙ্গালী যুবকদের চাকরী-মোহ দেখিয়া আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় অতি দুঃখেই বলিয়াছেন—

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়িয়াছিল। সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন ও রাজনারায়ণের সহপাটী তাঁহারা গ্রাজুয়েট হইলেই প্রথম লর্ড হাডিঞ্জের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বড় বড় চাকরী দিতেন। এই সময় হইতে ( বাঙ্গালীর ) মতিগতি যে চাকরীর দিকে গেল তাহা আর ফিরিল না। বাঙ্গলার ধনে ইংরাজ মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হইল, আর বাঙ্গালার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রী লাভের সাধনা করিতে লাগিলেন। সাধনা ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি চাকরী !

চাকরী করা নিন্দার্হ হইলেও সমাজের বহুসংখ্যক লোক যখন বর্ত্তমানে চাকুরীজীবী তখন তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা উচ্চ বেতনে চাকরী করেন তাঁহাদের অবশ্য 'পেটে খেলে পিঠে সয়।' তাঁহাদের দ্বারা

অনেক লোক উপকৃত হয় ইহা সত্য, কিন্তু যাঁহাদিগকে 'চুনো খেয়ে রবিবার নষ্ট' করিতে হয় তাঁহাদের উভয় কুল নষ্ট হয় অর্থাৎ গোলামীও করিতে হয় দুঃখ ও ঘুচে না। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এমন অনেক ভদ্রসন্তান বাস করেন যাঁহারা ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাবিহীন, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সাড়ে আটটার সময় কর্ম্মস্থলে যাইয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন এবং রাত্রি আটটা নয়টায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বিশ মাইল দূর হইতে যাতায়াত করিতে মাসিক বেতনের এক তৃতীয়াংশ রেলগাড়ীর ভাড়াতেই যায়। যাহা থাকে তাহা দ্বারা সংসারের কিছু আনুকুল্য হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে যদি একটী পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হয় তাহা অনেকেই কতকটা ধারণা করিতে পারেন এবং বুঝিতে পারেন যে এইরূপ জীবন বাঞ্ছনীয় কিনা। তাহা ছাড়া সওদাগারী আফিসে চাকরী করিলে, রবিবার বাদে বেশী দিন ছুটী পাওয়া যায় না। সুতরাং জীবনের অবসর ও আমোদ প্রমোদের দিকটাও অনেকটা শূন্য হইয়া যায়।

অনেক সময় এরূপ চাকরী হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করিতে হয়। তাহার মূলে কয়েকটী কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সাংসারিক অভাব

অনটনের তাড়া—দ্বিতীয়তঃ বেকার অপেক্ষা বেগার ভাল—না বেরুলে লোকে কি বল্‌বে এই লোকলজ্জা।

তৃতীয়তঃ মনের দুর্ব্বলতা অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজের ক্ষেত্র ( field ) নিজে প্রস্তুত করিবার সাহসের অভাব। তাহা ছাড়া পিতামাতা সন্তানের শৈশব হইতেই মনে করেন লেখাপড়া শিখিবার পর ছেলে চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে। এই মন্ত্র শুনাইয়া শুনাইয়া তাঁহারা ছেলের দাস মনোবৃত্তিটী পাকাপাকি রকমে গঠিত করিয়া তোলেন। কাজে কাজেই আধুনিক সভ্যতার প্রগতি অনুসারে ছেলেরাও চাকুরীর উমেদার। তাহার ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িয়া নিজের ক্ষেত্র ( field ) নিজে প্রস্তুত করিয়া লইবার সৎসাহসের অভাব ঘটে।

ইহার কুফল সামাজিক জীবনের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহা আজ সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী অবধারণ করিতে পারিতেছেন। যেখানেই চাকুরী সেখানেই দাস মনোবৃত্তি (slave mentality)। তবে স্থান বিশেষে ও কার্য্য বিশেষে উহার মাত্রা কম অথবা বেশী হয়। দাস মনোবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয় কেরাণীগিরিতে। যাঁহারা অল্প বেতনে কেরাণীগিরি গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ঐরূপ চাকরী করা এবং আত্মবিক্রয় করা একই কথা।

ঐ কারণে দেখা যায় যে, অল্প মূলধনে ছোট ব্যবসায় পরিচালনের দিকে চাক্‌রে বাবুদের বেজায় ঝোঁক। অনেকে সুযোগ মত ঐরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া থাকেন।

অল্প বেতনের চাকরী না করিলে অথবা করিতে করিতে উহা ত্যাগ করিলে যে জীবনসংগ্রামে হটিতে হয় না তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আমার পরিচিত এক জন ভদ্রলোক কোন সওদাগরী আফিসে পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন, দশ বৎসর বিশ্বস্তভাবে ( faithfully ) চাকরী করিবার পর তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ বেতন বৃদ্ধি হইল পঁয়ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত। অতঃপর ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেওয়ায় তাঁহার চাকরীর জবাব হইল। দুই এক মাস সপরিবারে কলিকাতায় থাকিবার মত অর্থ তাঁহার হাতে ছিল না, কাজেই স্ত্রী পুত্রাদি দেশে পাঠাইয়া দিয়া স্বাধীনভাবে দু'পয়সা রোজগার করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের দালালী আরম্ভ করিলেন। আরাম বিরামের দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া প্রায় এক মাস নানা স্থানে ঘুরিয়া একটী কাজ জুটাইলেন। ষোল হাজার টাকা মূল্যের একটী বাড়ী বিক্রয় করাইয়া দিয়া তিনি উভয় পক্ষের নিকট হইতে যে টাকা পাইলেন, আফিসে চাকরী করিলে তাহা এক বৎসরেও পাইতেন না। সেই দিন হইতে

তিনি নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন এবং স্বাধীন ব্যবসায়ের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিলেন।

## যুক্ত-পরিবার প্রথা

যুক্ত-পরিবার প্রথা প্রত্যক্ষভাবে অর্থোপার্জ্জনের একটী পথ না হইলেও পরোক্ষভাবে বহু পরিবারের অর্থ বৃদ্ধির অনুকূল বলিয়া ঐ বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। কোন পরিবারের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কথা উঠিলে এই প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই উত্থিত হয়।

আমাদের দেশে বহু কাল হইতে ঐ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই প্রথার যে সুখ ছিল, এখন নানা কারণে তাহা লুপ্ত হইতেছে। প্রধান কারণ এই যে, ইংরাজেরা উহা পছন্দ করেন না। আমরা তাঁহাদের অনুকরণ করি বলিয়া আমাদের দেশেও ঐ বিষয়ে অরুচি দেখা দিয়াছে। এই প্রথা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এমন কথা বলা যায় না উহার গুণও আছে দোষও আছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক একটী পরিবারে বাবা, জ্যেঠা, খুড়া এবং তাঁহাদের অভাবে বড় ভাই থাকিতেন গৃহের

কর্ত্তা বা পরিচালক। কর্ত্তার নিজের এবং উপার্জ্জনক্ষম অন্য সকলের উপার্জ্জিত অর্থ কর্ত্তার নিকট জমা হইত। সংসার খরচ বাদে উদ্বৃত্ত টাকা জমিত এবং তাহা দ্বারা যৌথভাবে সম্পত্তি ক্রয় করা হইত। কর্ত্তার উপর পরিবারবর্গের অখণ্ড বিশ্বাস থাকিত। কর্ত্তারও সূক্ষ্ম বিচার, নিরপেক্ষ ব্যবহার, গভীর দায়িত্ব জ্ঞান, এবং নিঃস্বার্থপরতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। তাহার ফলে তাঁহার পরিবারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত এবং উহা একটী শান্তিনিকেতন বলিয়া মনে হইত।

যুক্তপরিবারের বিশেষ সুবিধা এই যে, পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের জন্য পৃথক্ সরঞ্জামী খরচ (establishment expense) লাগে না। আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হওয়াতে অধিক অর্থ সঞ্চিত হইবার সুবিধা হয় এবং পারিবারিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু যুক্ত পরিবারে বাস না করিলে, প্রত্যেক পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে সরঞ্জামী খরচ বহন করিতে হয়। কাজে কাজেই অধিক অথবা আদৌ অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সুতরাং পরিবারস্থ সকলের সমান আর্থিক উন্নতি হইতে পারে না। ভূদেব বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন—'তোমার সঞ্চিত অর্থে তোমার পরিজনের কিছু অংশ আছে।' এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই—নিজের উপার্জ্জিত অর্থ যুক্ত পরিবারের জন্য ব্যয়িত হইলে তাহার অপব্যয় হয় না।

যদি কোন যুক্ত পরিবারে আট জন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি থাকিয়া মাত্র তিন জন উপার্জ্জনশীল হন এবং অবশিষ্ট পাঁচ জন নিষ্কর্ম্ম বসিয়া থাকেন তাহা হইলে কিছুদিন পরে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিদের মনোভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যে সকল কারণে সাধারণতঃ যুক্তপরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যায় সেগুলি সমস্ত এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে মোটামুটীভাবে পক্ষপাতিত্ব, অলসতা এবং কলহ এই তিনটী হইল প্রধান কারণ।

পরিবারের মঙ্গলকামী প্রত্যেকেরই ঐগুলি এড়াইয়া চলা উচিত। যে পরিবারে উহার একটী দোষও আশ্রয় পায় সেখানে সুখশান্তি বিরাজ করিতে পারে না। যুক্ত পরিবার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এক জন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোককে বাড়ীর কর্ত্তা নিযুক্ত করা উচিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঐ বিষয়ে কর্ত্তার দায়িত্ব খুব বেশী। তাঁহাকে ধৈর্য্যশীল, নিরপেক্ষ এবং সর্ব্ব বিষয়ে সজাগ থাকিতে হয়। যাহার যেটুকু ন্যায্য দাবী তাহাকে সেটুকু দেওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য।

তাহা ছাড়া আর একটী বিশেষ মূল্যবান বিষয় আছে। উহা সহযোগিতা। এক পরিবারভুক্ত, এক দলভুক্ত অথবা সমব্যবসায়ীদের মধ্যে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করাই সহযোগিতা। পারিবারিক উন্নতির পক্ষে এই বিষয়টী

এত অধিক অনুকূল যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহার অভাবে এক একটী পরিবার, এক একটী সমাজ একেবারে উৎসন্ন যায়। অতএব পারিবারিক জীবনে উন্নতির কামনা করিতে হইলে সহযোগিতার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা যাক—এক পরিবারে হয়ত পাঁচ জন কর্ম্মক্ষম লোক বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অর্থোপার্জ্জন করেন এবং তিন জন নিশ্চেষ্ট ভাবে কাল হরণ করেন। উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, অনেক সময় যে সকল কাজের সহিত পারিবারিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করে তাহাতেও তাঁহারা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং পরিণামে তাঁহাদের এই প্রকার ভয়াবহ কর্ম্মবিমুখতাই অনর্থের মূল কারণ হইয়া থাকে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও পক্ষপাতিত্য, অলসতা এবং কলহ-প্রবৃত্তি প্রবেশ করিলে নানা প্রকার অশান্তি এবং ক্রমশঃ বিচ্ছেদ-ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। হয়ত কোন পরিবারে আট জন স্ত্রীলোক বাস করেন ; তাঁহাদের মধ্যে পাঁচ জন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সংসারের যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতে বাধ্য হন। পরন্তু অবশিষ্ট কয়েক জন নিয়ত আলস্যে কাল হরণ করেন। উপরন্তু কলহ, বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি, কুৎসা, মিথ্যা দোষারোপ প্রভৃতি দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি করেন। তাহার ফলে কর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রীলোকদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

ঐরূপ ব্যাপার যাহাতে সমূলে বিনষ্ট হয় তৎপ্রতি পুরুষদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। কোন অশান্তির হেতু উপস্থিত হইলে গৃহ-কর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার দায়িত্ব গুরুতর। সুতরাং তাঁহাকে ধীরভাবে জটিল বিষয় মীমাংসা করিতে হয়। হঠকারিতা গৃহকর্ত্তার ভয়াবহ দোষ। তাহা ছাড়া তাঁহাকে 'সব জান্তা' ভাবের প্রশ্রয় দিতে নাই। প্রত্যেক বিষয়ে পরিণত বয়স্ক ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হিতৈষী ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা উচিত। সকল ক্ষেত্রেই অধিকাংশের মতে কাজ করা উচিত কারণ, অধিকাংশ লোক যাহা ভাল বলিয়া মনে করে, প্রায় সব স্থলে তাহাই ভাল এবং নির্ভুল হয়।

এইরূপ অনেক দুর্ব্বলচিত্ত গৃহকর্ত্তা দেখা যায় যাঁহাদের কাজে ও কথায় অন্য কেহ প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা উহা সহ্য করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে কতকগুলি লোক এইরূপ খল প্রকৃতির যে তাহারা সর্ব্বদাই পরের অমঙ্গল সাধন করিয়া সুখী হয়। এই দুই শ্রেণীর লোকই অসহযোগিতা দোষে দুষ্ট। সহযোগিতা অভ্যাস করাই, ঐ প্রকার কুপ্রকৃতি দূর করিবার একমাত্র উপায়। প্রবাদ আছে—

মিলে মিশে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

যে সকল লোকের পিতামাতা বা কোন নিকট আত্মীয় নাই, তাঁহাদের, কোন সৎ অথচ প্রবীণ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা উচিত। পারিবারিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, কোন ক্রমেই সহযোগিতাকে অবহেলা করা চলে না।

সহযোগিতা এবং সহানুভূতির উপর যখন পারিবারিক শান্তি যথেষ্ট নির্ভর করে তখন প্রত্যেক পরিবারে উহা প্রবর্ত্তিত করা উচিত এবং যেখানে উহা চলিত আছে সেখানে সংরক্ষণ করা উচিত।

চিরদিনই যে এক একটী পরিবার যুক্ত প্রথায় চলিবে তাহা হইতে পারে না। সেরূপ হইলে এক একটী দেশের সমস্ত অধিবাসী হয়ত একটী পরিবারভুক্ত থাকিত। সাধারণতঃ ভাই ভাই এক পরিবারভুক্ত থাকেন। কোন কোন স্থানে ভ্রাতুষ্পুত্রেরা ও পিতৃব্যেরা যুক্তপরিবারে বাস করেন। কিন্তু তাহার পরে প্রায় আর একান্নবর্ত্তিতা বজায় থাকে না। জনৈক দার্শনিক বলিয়াছেন, যত দিন যুক্তপরিবার বজায় রাখা যায় তত দিন রাখা উচিত। কিন্তু বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিলে যুক্তপ্রথা বজায় রাখিবার জন্য জিদ করিতে নাই। মনে মনে অশান্তির আগুন পুষিয়া না রাখিয়া পৃথকভাবে বাস করিলে অশান্তির হেতু দূরীভূত হয়। যাহাতে পরিবার মধ্যে অশান্তি আশ্রয় লইতে না পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় সরকার এক স্থানে লিখিয়াছেন—"আসল কথা সুখ—দৌড় ঝাঁপে নহে, রাজনীতিতে নহে, ভারত উদ্ধারেও নহে,—(প্রকৃত) সুখ পারিবারিক শান্তিতে।" কথাটা কিরূপ মূল্যবান, সময়োপযোগী এবং ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য তাহা একটু চিন্তা করিলে সহজেই অনুধাবন করিতে পারা যায়।

## বেকার সমস্যা

### ( সমাধানোপায় )

বেকার সমস্যা আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের উন্নতি-পথে প্রধান অন্তরায়। উচ্চ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বহু লোক বেকার থাকায় অর্থ-নৈতিক দিক হইতে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকদিগের মধ্যে ইহা অতিশয় দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

এই অনর্থের কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রধানতঃ দেখা যায় যে, আধুনিক যুগের বহু কলকারখানা, সহস্র সহস্র শিল্পী ও শ্রমিকদিগের বেকারের কারণ হইয়াছে। অতএব কলকারখানার যুগের অবসান ব্যতীত শিল্পীও শ্রমিকদিগের বেকার সমস্যা দূরীভূত হওয়া কঠিন।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের ব্যাপক চাকরী-মোহ বেকার সমস্যার আর একটী কারণ। অধিকাংশ লোক দেশ ছাড়িয়া চাকরীর জন্য বিদেশে আসিতে চায়। এই বহির্মুখী প্রবৃত্তির ফল বহু ক্ষেত্রে অত্যন্ত অকল্যানকর হইতেছে।

শিক্ষিত শ্রেণীর বেকার সমস্যা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। উহার সমাধানকল্পে অনেক জল্পনা কল্পনা হইতেছে বটে কিন্তু তাহাতে এই ব্যাপক সমস্যার সমাধান হইতেছে না। শিক্ষিতদের শিক্ষাভিমান, তাঁহাদের বেকার সমস্যার একটী প্রধান কারণ। সাধারণ লোকে যেরূপ কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির সেরূপ করিবার সৎসাহস নাই, সামর্থ্যও নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সহিত খাপ খায় না এমন কাজ তাঁহারা গ্রহণ করিতে রাজী হন না। অনেকে বলেন, "যদি অশিক্ষিত এবং অল্প-শিক্ষিত লোকের কার্য্য অবলম্বন করিলাম, তাহা হইলে আমাদের উচ্চশিক্ষার সার্থকতা কি হইল!"

শিক্ষিত ব্যক্তিরাই জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, প্রফেসার, প্রভৃতি হইয়া থাকেন। তাই বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই যে ঐরূপ হইবেন তাহা কখন সম্ভব নহে। সকলের পক্ষে ঐরূপ আশা পূর্ণ হয় না। ঐ সব বিষয়ে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তখন অন্য চেষ্টা করিতে হয়। শিক্ষিতেরা শিক্ষকতা, সওদাগরী আফিসে চাকরী গ্রহণ ইত্যাদি বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল বৃত্তি

অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যেও কঠোর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। চাকরীর সন্ধানে অনেকের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতেছে অথচ চাকরীর যোগাড় হইতেছে না। এদিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সময় চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিয়া কতদূর অন্যায় কাজ করা হয় তাহা প্রত্যেক সাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক সহজেই বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায় জীবনের যুগ-প্রবর্ত্তক আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী যুবকদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, কারণ তাহারা নির্দ্দিষ্ট অপেক্ষা অনির্দ্দিষ্টকে অধিক পছন্দ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধের কারখানা। তাহা স্থাপন করিবার অব্যবহিত পরে প্রফুল্ল চন্দ্র ঔষধাদির ব্যাগ নিজ হস্তে বহন করিয়া কলুটোলা অঞ্চলে দোকানে দোকানে ঔষধ দিয়া এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া কারখানায় আসিয়াছেন। তখন তিনি এম, এ; ডি, এস্-সি প্রভৃতি উপাধিমণ্ডিত এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কিরূপে শিক্ষাভিমান বর্জ্জন করিতে হয় আচার্য্য রায় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এইরূপ অনেক লোক দেখা যায় যাঁহারা নিজ নিজ উন্নত আর্থিক অবস্থার অভিমান করিয়া কর্ম্মবিমুখ থাকেন।

বলা বাহুল্য, তাঁহারা ঐরূপে বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মই মানব জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সাধারণতঃ ধনী সওদাগর জমিদার, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রভৃতি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সন্তানেরা ঐরূপ ধনাভিমানী এবং শ্রমবিমূখ হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মনে করা উচিত যে, দিল্লীর বাদশাহ নাসীরুদ্দিন কোরান নকল করিয়া এবং টুপি সেলাই করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবও টুপি সেলাই করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। উক্ত আদর্শ চিন্তা করিলে, কোন ব্যক্তির ধনাভিমান থাকিতে পারে না।

অস্মদ্দেশীয় কোন কোন মনীষী বলেন যে, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের পক্ষে কৃষি কার্য্যই প্রশস্ত জীবনোপায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ দিকে মনোযোগী হইলে দুইটী উপকার হইতে পারে—প্রথমতঃ তাঁহাদের নির্দ্দেশে চালিত বেকার লোকেরা কাজে লাগিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিত লোকদের সংস্পর্শে আমাদের দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কৃষি বলিতে কেবল মাত্র নানাবিধ ফসল উৎপাদন না বুঝিয়া নানাবিধ শাক সব্জী, ফল প্রভৃতি উৎপাদনও কৃষি মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

একটু চিন্তা করিলে সহজে ধারণা করা যায় যে, কর্ম্মে রত হওয়াই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। কিন্তু

কে কিরূপ কর্ম্ম অবলম্বন করিবে ইহার সমাধান সহজে হয় না। তাহার ফলে অনেক সময় ভুল পথে চলিয়া উন্নতির পথ রুদ্ধ করা হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই এক এক দিকে আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়। কেহ কেহ শৈশব হইতেই কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে বা বিষয়ে অনুরাগী হয়। সুতরাং যাহার যে দিকে ঝোঁক, বিনা আপত্তিতে, সেই দিকে তাহার কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে বহু বেকার লোক কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে এবং সমাজের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতির আশা করা যায়।



# পরিশ্রমই উন্নতির মূল

পরিশ্রমই উন্নতির মূল, ইহা সর্ব্বজনবিদিত এবং অতি পুরাতন কথা। অনেক সময় আমরা অনেক মূল্যবান উপদেশ ভুলিয়া যাই, সেই জন্যই এ বিষয়ে আলোচনা।

কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ পরিশ্রমী। তাহারা নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অনেক উন্নতি অর্জ্জন করে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

পরন্তু অলস ব্যক্তিরা, উন্নতি করা দূরে থাকুক, যে অবস্থায় তাহারা সংসার-যাত্রা আরম্ভ করে, ক্রমশঃ তাহা অপেক্ষা হীন অবস্থায় উপনীত হয়।

অলসতা দূর করিতে হইলে, কানা, খোঁড়া, অন্ধ, মূক, বধির অথবা ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের প্রতি অলসদিগের দৃষ্টি-পাত করা উচিত। তাহাদের অপটু এবং বিকলাঙ্গ দেহের সহিত অলসদিগের নিজ নিজ পূর্ণাবয়ব দেহের তুলনা করিলে অলস লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবে, তাহারা ভগবানের দানের কিরূপ অপব্যবহার করিতেছে। প্রকা-রান্তরে তাহারা যে পাপানুষ্ঠান করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। সুস্থ, সবল, এবং পরিপুষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপব্যবহার করা এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করা এই দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

নিজের উপর যাহার বিশ্বাস নাই, যে নিজেকে পরি-চালিত করিতে পারে না সে আত্মঘাতী। 'পরিশ্রম সকল সুখের মূল' এই উপদেশটী কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলে অলসের আলস্য দূরীভবনের সাহায্য হইতে পারে।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না। কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে, যদি ঝোপ বুঝে কোপ মারা না যায় তাহা হইলে অনেক স্থলে পরিশ্রমের যোগ্য

ফল পাওয়া যায় না। সেই জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে দেখা উচিত যে উক্ত বিষয়ে নিজের যোগ্যতা, আকর্ষণ এবং আগ্রহ কতখানি আছে। যে কর্ম্মে সম্পূর্ণ ইচ্ছা নাই, অন্যের অনুরোধ ও চক্ষুলজ্জার খাতিরে, কিম্বা বিবেচনার অভাবে হয়ত সেরূপ অনুপযোগী ব্যবসায় গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সকল কর্ম্মে প্রায়ই আশানুরূপ উন্নতি হয় না। ডাক্তার হইলে যিনি অধিক উন্নতি করিতে পারিতেন, তিনি ওকালতী করিলে তাঁহার বিশেষ উন্নতি না হইতে পারে। ব্যবসায়ের দিকে যাঁহার বুদ্ধি ঘুরে এবং আগ্রহ আছে, তিনি যদি আইনজীবী হন তাহা হইলে তাঁহার যথাযোগ্য উন্নতি না হইতেও পারে। যিনি কাষ্ঠ-শিল্প বিষয়ে অনুরাগী তাঁহাকে তহশীলদারী করিতে হইলে, বিরুদ্ধ কর্ম্মে উন্নতি না হইতেও পারে। বহু ক্ষেত্রে এইরূপ ইচ্ছা এবং যোগ্যতার বিরুদ্ধে পরিশ্রম করিয়া উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। সেই জন্য কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে এমন কর্ম্মপথ ও কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইতে হয় যাহা নিজ নিজ যোগ্যতার পথে প্রতিবন্ধক না হয় বরং উহার পোষকতা করিয়া উন্নতির পথ ক্রমশঃ মুক্ত করিয়া দেয়। চিত্তবৃত্তির অনুকূল বিষয়ে পরিশ্রম কখন নিষ্ফল হয় না।

---

## দ্বিতীয় খণ্ড

# ব্যয়নীতি

সভ্য সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক গৃহস্থকেই সংসার প্রতিপালনের জন্য কিছু কিছু অর্থব্যয় করিতে হয় কারণ, নিত্য ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যই অর্থ বিনিময়ে সংগৃহীত হয়। অতএব সংসার-যাত্রায় অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী। দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে ব্যয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। ধনী ও দরিদ্রের ব্যয়ে বহু প্রভেদ। কোন কোন স্থানে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ না কিনিলেও চলে। আবার স্থান বিশেষে জল ও মাটীটুকু পর্য্যন্ত কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সেইজন্য স্থান ও অবস্থাভেদে খরচের তারতম্য হয়।

দুই জন বিভিন্ন অবস্থার লোকের মধ্যে আয়ব্যয়ের পার্থক্য থাকিলেও প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ আয়ব্যয়ের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কেহ উপার্জ্জিত অর্থ সবই ব্যয় করিয়া ফেলেন, কেহ হয়ত, আয় অপেক্ষা অল্প ব্যয় করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন আবার কেহ হয়ত, ঋণ গ্রহণ করিয়াও আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকেন। যাহা হউক, উল্লিখিত তিন শ্রেণীর গৃহস্থদের মধ্যে কাহার কার্য্য প্রশংসার্হ এবং কাহার কার্য্য নিন্দার্হ সে বিষয়ে

কোন মতামত প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়া আয়ব্যয়ের তুলনা করিতে হয়।

আয়ব্যয় বিষয়ে চিন্তা করিয়া পণ্ডিতেরা যে সাধারণ নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা এই—

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত, লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥

অবেক্ষয়া ( যত্ন সহকারে ), তীর্থেষু ( সাধু ব্যক্তিকে বা যোগ্য পাত্রে ) অর্থঃ—যে ধন লাভ করা হয় নাই তাহা ( সদুপায়ে ) লাভ করিবে, লব্ধ অর্থ বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে, রক্ষিত অর্থ ( বাণিজ্য দ্বারা ) বর্দ্ধিত করিবে এবং ( উদ্বৃত্ত অর্থ ) যোগ্য পাত্রে দান করিবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে অর্থের আদান প্রদান ( transaction of money ) মন্দীভূত হইলে সমাজের লোকদিগের বিশেষ অসুবিধা হয় কারণ অর্থস্রোতই সমাজের কর্ম্মস্রোতকে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত ( control ) করিতেছে। অতএব যাহাতে পয়সাকড়ি অধিক চলাফেরা করিতে পারে, সেদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। তাহা দ্বারা সমাজের সকল অবস্থায় লোক স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু অর্থ নির্দ্দিষ্ট এক স্থানে বদ্ধ অবস্থায় থাকিলে সে সুবিধা থাকে না।

হিন্দুদের পূজা-পার্ব্বণ, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, সেগুলির মূলে এই মূল্যবান নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব ব্যাপারে গুরুপুরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকীঢুলী পর্য্যন্ত বহু লোকের অল্প বিস্তর অর্থ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পূজা উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করিতে হইলে বিবিধ জিনিষের বিক্রেতারাও অর্থ পাইয়া থাকে। সুতরাং সমাজের অর্থ-স্রোতকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে অর্থের যথাযথ বণ্টন (distribution) নিতান্ত আবশ্যক।

---

## সদ্ব্যয়-নীতি

সমাজের মধ্যে এমন অনেক সঙ্কীর্ণচেতা লোক আছেন যাঁহাদের প্রচুর সঞ্চিত অর্থ থাকিতেও তাঁহারা অন্ধের হাতে একটী পয়সা দিতে নারাজ; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব দুরবস্থায় পড়িলে তাহাদিগকেও সাময়িক সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত। ঐরূপ লোকেরা সর্ব্বদা যক্ষের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে ব্যস্ত থাকেন। পুঁজি করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। এইরূপ প্রবৃত্তি এবং কার্য্য দ্বারা ধন সঞ্চয়ও হয় পাপ সঞ্চয়ও হয়।

আর এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা মনে করেন—ভগবান দেনেওয়ালা, তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে এক দিনে রাজা করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিনি যখন দেওয়ার মালিক তখন ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া কোন লাভ নাই। যাহা কিছু অর্থ হাতে থাকে সবই নির্ব্বিকারে ব্যয় করিয়া ফেলা উচিত। এইরূপ দিলদরিয়া মেজাজ লইয়া সংসারে থাকিতে হইলে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়া এবং ঋণ ভার বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সমাজে তাহার বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে।

উল্লিখিত দুই প্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন নীতির মধ্যে কোনটীই প্রশংসার যোগ্য নহে, কারণ দুইটীই চূড়ান্ত নীতি ( extreme principles )। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী নীতি সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।

আয়ের অনুরূপ ব্যয় করাই আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার মূল মন্ত্র। ইহা অতি স্থূল নীতি হইলেও সমাজের পক্ষে তথা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং কার্য্যকরী। যাঁহারা নিজ নিজ আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে পারেন না, তাঁহারা পদে পদে একথা স্বীকার করিবেন যে 'আয় বুঝিয়া ব্যয় না করিলে' কখনও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে— Cut your coat accor-

ding to your cloth—অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় কর। ইহাই অর্থব্যয়ের মূল নীতি।

---

# ধন-সঞ্চয়

সঞ্চয় ব্যতীত কেহ কখন আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না। পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গদিগের মধ্যেও সঞ্চয়-প্রবৃত্তি ( instinct ) দেখিতে পাওয়া যায়। সুসময়ে তাহারা কিছু খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছির মধু-সঞ্চয়, ইঁদুরের শস্য-সঞ্চয় প্রভৃতি ব্যাপার ঐ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত।

আদিম কালে মানুষ যে দিন বুঝিয়াছিল যে আগামী দিনের জন্য তাহাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, সেই দিন হইতে তাহার মধ্যে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। সঞ্চয় বলিলে শুধু অর্থ সঞ্চয় বুঝায় না। খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি যে কোন জিনিষ পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখাকে সেই জিনিষের সঞ্চয় বলে। আমরা এখানে সঞ্চয় বলিতে অর্থ সঞ্চয় বুঝিব। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ও ধন-সঞ্চয় সাংসারিক অর্থোন্নতির প্রকৃষ্ট

উপায়। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, সঞ্চয় না করা মহাপাপ।

সঞ্চয়ী লোকেরা সমাজের হিতৈষী এবং অসঞ্চয়ীরা সমাজের পরম শত্রু। পারিবারিক জীবনে কষ্ট পাইয়া যাঁহারা অধিক অর্থ সঞ্চয় করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা ভ্রান্ত। ন্যায্য ব্যয় করিয়া যাহা থাকে তাহাই সঞ্চয় করা উচিত।

কিরূপে উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয় সে বিষয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ একটী মূল্যবান পরিস্থিতি দিয়াছেন—তাঁহাদের মতে, উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধেক সংসার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা উচিত। সিকি অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া অবশিষ্ট সিকি অংশ সজ্জনকে দান অথবা সদনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা উচিত। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে, উক্ত নিয়ম সকলের পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য না হইলেও উহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একটী মূল নীতি। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থ-সঞ্চয় নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়, একথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেরাই বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক বেকন্ ( Bacon ) বলিয়া গিয়াছেন, যত আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিবে। * * কিন্তু নব্য ইংরাজেরা * * সঞ্চয়ের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। এ দেশের

কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কোন কোন ইংরাজ এমন সঞ্চয়শীল যে, তাঁহাদের মাসিক বেতন দুই তিন হাজার টাকা হইতে মাত্র দুই তিন শত টাকা খরচ করেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে, ভবিষ্যৎ কালের জন্য আয়ের সিকি রাখিবে ; অর্দ্ধেকে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিবে। আর এক আনা ( অংশ ) ধার দিয়া সুদে বাড়াইবে। মনু বলিয়াছেন, তিন বৎসরের যোগ্য অথবা এক বৎসরের যোগ্য নতুবা তিন দিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে।

"সকল দেশের লোকের পক্ষে সম পরিমাণ সঞ্চয় সম্ভবে না। যে ব্যক্তির আয় প্রতি দণ্ডে দশ টাকা তাঁহার ব্যয় প্রতি দণ্ডে পাঁচ টাকা হয় না। তাঁহার সঞ্চয় অর্দ্ধেকের বেশী হয়। * * * যাঁহার বেতন মাসিক তিন শত টাকা কিন্তু পরিবার অতি বৃহৎ এবং জ্ঞাতি কুটুম্বের ভার অত্যধিক, তাঁহার ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক যে, তিনি কোন মতেই তিন শতের ভিতর হইতে দুই শত খরচ না করিয়া চালাইতে পারেন না। বিশ, পঁচিশ টাকার আমলা, মুহুরী বা স্কুল মাষ্টার আপনার পরিবারের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেই বিব্রত ; তিনি ঐ আয় হইতে অর্দ্ধেক বা সিকি কি করিয়া বাঁচাইবেন ? * * * সুতরাং আয়ের অর্দ্ধেক, তৃতীয়াংশ বা সিকি বাঁচাইবে বলিয়া যে উপদেশ, তাহা জন সাধারণের প্রতি খাটিবে না। উপদেশ ঃ—তথাপি সকলকে কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে। যে, দিন আনে সে

প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে; যে, মাসে আনে সে প্রতিমাসে সঞ্চয় করিবে, যে বর্ষে আনে সে প্রতিবর্ষে সঞ্চয় করিবে। আর একটী নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে পরভাগে নয়। যাহা রাখিতে পারিবে তাহা পূর্ব্বেই রাখিয়া দিবে। যাহা সঞ্চয় হইল তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিবে না। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে; তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ তাহাতেও তাহাদের অংশ আছে। পারিবারিক প্রয়োজন ভিন্ন তুমি নিজের জন্য যদি সঞ্চয়ের ধন খরচ করিয়া ফেল তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে।”

অর্থই শক্তি। সুতরাং হাতে পয়সা থাকিলে শক্তি পরিচালনের যন্ত্রও হাতে থাকে। কিন্তু সঞ্চয় না করিলে অর্থ কার্য্যকরী হইবে কিরূপে? অর্থশালী ব্যক্তি ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন, দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র এবং আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিতে পারেন। সঞ্চয়বিহীন ও অপব্যয়ী লোকেরা মানব সমাজের উন্নতির অনুকূলে কিছুই করিতে পারে না বরং পরোক্ষভাবে প্রতিকূলাচরণ করে। সঞ্চয় না করিয়া কেহ ধনী হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করিয়া কেহ দরিদ্র হইয়াছে এমন কথা শোনা যায় না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল লোক অর্থ সঞ্চয় করে না তাহাদের পুত্রাদি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার সময় যথোচিত অর্থ-সাহায্য না পাওয়ায় যথেষ্ট

অসুবিধা ভোগ করে। অনেককে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হয়। স্থল বিশেষে দুই তিন পুরুষ ধরিয়া তাহার ফল ভোগ হয়।

সঞ্চয় না করিলে জীবনযুদ্ধে যে কিরূপ বেগ পাইতে হয় তাহা ভুক্তভোগীরা উত্তমরূপে বুঝিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। সঞ্চয়ীদিগের আজীবন সঞ্চিত অর্থ, অপব্যয়ী উত্তরাধিকারিদিগের হস্তে অল্পকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ নাড়াচাড়া করিয়া, ব্যবসায় বাণিজ্যে খাটাইয়া পুত্র পৌত্রেরা সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সঞ্চয় করিলে তাহার সুফল কেহ না কেহ ভোগ করিবেই—সে নিজ জন হোক বা অপর কেহ হোক।

মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়শীলতা অভ্যাস করিতে হইলে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের, স্থানীয় পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে, একটী হিসাব খোলা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা সুযোগ মত কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন। বহু গৃহস্থ ঐরূপে কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার গৃহস্থেরা বিশ্বস্ত বীমা কোম্পানীতে টাকা জমা দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে এককালীন বেশী টাকা পাইয়া থাকেন।

**সঞ্চয়ের কুফল**—বহু ক্ষেত্রে অপব্যয়ী উত্তরাধিকারী সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করে বলিয়া বিলাতের অনেক ধনী লোক জীবদ্দশায় স্বীয় সঞ্চিত অর্থ দ্বারা এক একটী সৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া যান। উত্তরাধিকারিদিগের জন্যও তাঁহারা সঞ্চিত অর্থের কতকাংশ রাখিয়া যান। ভবিষ্যতে অপব্যয় হইবে এইরূপ বুঝিলে উপযুক্ত উইল-পত্র দ্বারা উক্ত অর্থ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। ঐরূপ ব্যবস্থা যেখানে হয় না সেখানে সঞ্চিত অর্থ—'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়'। আমাদের দেশের ধনী মাত্রেরই সে কথা স্মরণ রাখা উচিত।

---

## মিতব্যয়

একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "Economy is the easy chair of old age" অর্থাৎ মিতব্যয়িতা বৃদ্ধ বয়সে আরাম-কেদারার কাজ করে। কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও অনুশীলন আবশ্যক। প্রত্যেক পয়সাটী খরচ করিবার সময় চিন্তা করা উচিত, সেটী ন্যায্য অথবা অন্যায্য ব্যয়িত হইতেছে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, "Take care of pennies and pounds will take care of themselves" অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া

অর্থ সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতে অর্থশালী হইতে পারা যায়। ঐরূপ অভ্যাস ব্যতীত সঞ্চয়শীল হওয়া সহজ নহে।

যতক্ষণ পাত্রে মধু থাকে ততক্ষণ পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি ঐ পাত্রের আশে পাশে ঘুরিতে থাকে—একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। কিন্তু মধু নিঃশেষ হইলে কোন প্রাণী উহার নিকট আসে না। যাহার তহবিলে টাকা থাকে বহু লোক তাহার আজ্ঞাধীন হয়। পরন্তু অর্থাভাব ঘটিলে ঐ সকল লোককে আর তাহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ ঘটনা প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যিনি যতই উদারচেতা হউন না কেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যয় সম্পর্কীয় উদারতা সঞ্চয়শীলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। The passion for squandering money must be restrained by the strong sense of frugality.—অপব্যয়ের প্রবৃত্তিকে সঞ্চয়শীলতা দ্বারা প্রশমিত করিতে হইবে। সঞ্চয় না করা পাপ একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সময় মত সঞ্চয় না করিলে শেষ বয়সে যে কিরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নহে।

Dr. Smiles বলিয়াছেন—There can be nothing more distressing than to see an old man, who has spent the greater part of his life in well paid-for labour, reduced to the necessity of begging for bread and relying * * on the

bounty of strangers. Such a consideration should inspire men in early life with a determination to work and to save for the benefit of themselves and their families in later years. জীবনের অধিকাংশ সময় স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এমন এক জন বৃদ্ধকে যদি বাধ্য হইয়া অপরিচিত লোকেদের কাছে রুটী ভিক্ষা করিতে হয়—তাহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের বিষয় চিন্তা করিয়া, প্রত্যেক লোকের প্রথম জীবনে পরিশ্রম এবং অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যাহাতে ভবিষ্যতে নিজের এবং পরিবারবর্গের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা প্রায় সমপর্য্যায়। ঐ বিষয় অভ্যাস করিতে হইলে জীবন-যাপন প্রণালীকে ( style of living ) সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু দিগের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে মিতব্যয়িতার সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায়। অপব্যয় করেন না বলিয়া তাঁহাদের সুখ্যাতি আছে। তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের ঐ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা উচিত।

## মিতব্যয়িতার উপায়

মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে হইলে ঐ বিষয়ে আগ্রহ এবং একাগ্রতা থাকা চাই। অনুশীলন দ্বারা এই গুণটী অধিকার করা যায়। ইহা অভ্যাস করিতে হইলে 'আয় বুঝে ব্যয় কর'—সব সময় এই কথাটী মনে রাখিতে হয়। বিলাসিতা, সাড়ম্বর-জীবন-যাপন ( high style ), পরের পরামর্শে তুরায়ত্ত কোন কার্য্য হস্তক্ষেপ করা, অন্যায় জিদ, হঠকারিতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি যে সকল কারণে অর্থের এবং শক্তির অপব্যবহার হয় সর্ব্বদা সেগুলি এড়াইয়া চলা উচিত। যাহারা ঐসব বিষয়ে উদাসীন তাহাদের উপর অমিতব্যয়িতা অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করে।

বিলাস-দ্রব্য এবং অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। অনেক লোক ঐরূপ তুর্ব্বল-চিত্ত যে, কোন জিনিষের অভাব বোধ করিবা মাত্র উক্ত অভাব পূরণের জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে এবং উহার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। হাতে পয়সা না থাকিলে ধার কর্জ্জ করিয়াও অভাব পূরণ করে। ঐরূপ অবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে অপব্যয়ের হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ঐরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বে কাজ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে।

ঐ সকল অপব্যয়ীরা নিজ নিজ উপার্জ্জন ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিলে অপব্যয় প্রশমিত হইতে পারে। যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করিবার যোগ্য হন নাই, তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত, ব্যক্তিগত সামর্থ্যে অর্থোপার্জ্জন করিতে গেলে নিজ যোগ্যতানুসারে মাসিক যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছেন কিনা। যদি নিজের কাছে নিজে কৈফিয়ৎ দিতে না পারেন তাহা হইলে অপব্যয়ের প্রবৃত্তি কখনও প্রশ্রয় পাইবে না।

যাঁহারা বিবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় প্রয়োজনের মাত্রা স্থির করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত হিসাব অনুসারে চলা উচিত। উক্ত নীতি অবলম্বন করিবার জন্য, পূর্ণ বয়স্ক লোকের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাসকাবারী হিসাব স্থির করিতে হয়। মাছ, দুধ, তরকারী ইত্যাদি কাঁচা জিনিষ ব্যতীত এক মাসের যোগ্য অন্যান্য জিনিষ সাধ্যানুসারে এক দিনে কিনিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এক জন পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রত্যেক দিনের জন্য চাউল বা আটা ৮ ছটাক; ডা'ল ২ ছটাক; তরকারী ৩ ছটাক দুগ্ধ ৮ ছটাক; মাছ, মাংস ডিম (নিরামিষাসীর জন্য ছানা) ২ ছটাক; তৈল বা ঘৃত ১ ছটাক লবণ ¼ ছটাক; মিষ্ট ও ফল ২ ছটাক—মোট ২৬¼ ছটাক (দুই বেলার)। লোক বিশেষে খাদ্যের মাত্রা কম বেশী হইতে পারে।

অধিকন্তু এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি দশ দিন অন্তর একটু বিশেষ রকম খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইবে। তাহা হইলে পরিবারবর্গের ক্ষোভের কারণ থাকে না অথচ অপব্যয় বন্ধ হইয়া দু'পয়সা সংস্থানের উপায় হয়।

মাসকাবারী বন্দোবস্তের একটী দোষ আছে। কোন কোন পরিবারের গৃহিণীরা এরূপ অগোছ যে, এক দিনে এক মাসের মত জিনিষ পাইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত খরচ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অগোছ এবং অবহেলার ফলে এক মাসের উপযোগী জিনিষ হয়ত কুড়ি দিনেই নিঃশেষ হয়। অতএব মাসকাবারী ব্যবস্থার কুফল বিবেচনা করিয়া গৃহস্থদিগের সময় মত সতর্ক হওয়া উচিত।

**ঐ বিষয়ে স্ত্রীজাতির দায়িত্ব**—পারিবারিক জীবনের অভাবঅনটন, অমিতব্যয় প্রভৃতি ব্যপারে সাধারণতঃ পুরুষদিগকে দায়ী করা হয়। কিন্তু গৃহকর্ত্রীরাও যে সেজন্য যথেষ্ট দায়ী সে দিকে অনেকের লক্ষ্য নাই। বহু ক্ষেত্রে গৃহস্বামিগণ মিতব্যয়িতা, সঞ্চয়শীলতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইয়াও, গৃহিণীদের দোষে পারিবারিক অবস্থা উন্নত করিতে পারেন না। গৃহিণীদের অবহেলায় এক একটী পরিবারের উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। অতএব যাহাতে তাঁহারা মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিতে পারেন যে দিকে পুরুষদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

## মিতব্যয়িতার কয়েকটী ব্যবহারিক বিধি

১। কোন অনাবশ্যক জিনিষ সস্তা হইলেও কদাচ তাহা ক্রয় করিতে নাই।

২। প্রত্যেক জিনিষ নগদ মূল্যে ক্রয় করা উচিত। অবস্থার প্রতিকূলতা বশতঃ নগদ কিনিতে না পারিলে পাওনা দারের টাকা যত সত্বর সম্ভব মিটাইয়া দেওয়া উচিত।

৩। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজে দেখিয়া কেনা উচিত। তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে উত্তম জিনিষ পাওয়া যায়।

৪। প্রত্যেক গৃহস্থের দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা কর্ত্তব্য।

৫। সাংসারিক খরচপত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই পরিস্থিতি ( budget ) স্থির করা উচিত; তাহাতে কিছু অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে।

৬। মিতব্যয়িতার জন্য গৃহিণীদিগের সহযোগিতা প্রয়োজন। সুতরাং সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

---

# বিলাসিতা বর্জ্জন

সঞ্চয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক বিলাসিতা। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে উহা বর্জ্জন করা উচিত। বিলাসিতা পরিহার করিতে হইলে উহার উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইতে হয়। সাধারণতঃ বিলাসিতা বলিতে অযথা বাবুগিরি বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে বিলাসিতা বলিতে, অযথা চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদির ব্যবহার এবং সুখ-প্রিয়তা বুঝায়। অতএব বিলাসিতার কোন নির্দ্দিষ্ট মান নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা উহার মান নিরূপিত হয়। এক জন জমিদারের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় বস্তু এক জন মধ্যবিত্তের পক্ষে তাহা বিলাস-দ্রব্য আবার মধ্যবিত্তের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় এক জন মজুরের পক্ষে তাহা বিলাসিতার বস্তু। বিলাসিতা-প্রবৃত্তি মানুষের অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতা সূচনা করে। উহা আর্থিক উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক। বিলাসিতার দোষে এক একটী প্রসিদ্ধ পরিবার এমন কি এক একটী জাতি অধঃপতিত হইয়াছে, রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। মনীষিপ্রবর রবীন্দ্র নাথ এক স্থানে বলিয়াছেন—

"আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু একথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে অর্থ সাধারণ

কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহার ফল হইতেছে, দেশের ভোগ বিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাঙ্গলাদেশে পল্লীতে দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান পানের অযোগ্য হইতেছে। গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যে দেশ বারো মাসে তের পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ আকৃষ্ট হইয়া কোঠা-বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া, সাজ সরঞ্জাম, আহার বিহারে উড়িয়া যাইতেছে।"

দেশীয় চারুশিল্পের উন্নতি বিধান করা এবং বিলাসিতা বর্জ্জন করা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। ঐ দুইটি বিষয় এক সঙ্গে পোষণ করা যায় না। এ দেশে এমন কতকগুলি মুষ্টিমেয় অর্থবান লোক যুগে যুগে বাস করেন যাঁহারা সংযতভাবে বিলাস দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলেও কোন দিন তাঁহাদিগকে দারুণ অর্থাভাবে পড়িতে হয় না। তাঁহাদের পক্ষে সংযত বিলাসিতা দোষনীয় নহে। কিন্তু সব সময় তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, বিদেশীয় বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় বিলাস-দ্রব্য, বিশেষতঃ কুটীর-শিল্প-জাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে প্রত্যক্ষভাবে জাতির ও সমাজের উপকার করা হয়।

সে ক্ষেত্রে বিলাসিতাজনিত অন্যায় কতকটা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে।

যাঁহারা বিলাসিতা করিলে আর্থিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কি, অন্নবস্ত্রের সমস্যাও জটিল হইয়া উঠে, তাঁহাদের পক্ষে বিলাসিতা করা মহাপাপ। বিলাসিতা বর্জ্জন করিলে তাঁহাদের উন্নতি সম্ভব হয়। কোন বিশেষ কারণে উন্নতির বিঘ্ন ঘটিলেও তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ থাকে না। কিন্তু বিলাসিতাজনিত আর্থিক অবনতির পশ্চাতে অনন্ত ক্ষোভ সঞ্চিত থাকে এবং দুরবস্থা ঘটিলে উক্ত অপকার্য্য শত বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করে। নিজ নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং উন্নতির জন্য আগ্রহ থাকিলে বিলাসিতা করিবার প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিলাসিতা-ব্যাধি সংক্রামকভাবে আত্মবিস্তার করিয়াছে। তাহার ফলও বিষময় হইতেছে।

বাবুগিরির সমর্থন করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন, প্রয়োজন (necessity) কমাইয়া দিলে যোগ্যতার ( efficiency ) হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু সে কথা সমর্থনযোগ্য নহে। যে দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর, বৎসরের মধ্যে ছয় মাস দুই বেলা অন্ন জুটে না, সে দেশের লোকের পক্ষে এরূপ ধারণা পোষণ করাও কলঙ্কের বিষয়। তাহা ছাড়া মানুষের যোগ্যতা, খ্যাতি, কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতি যে বহি-

রাবরণ অথবা বিলাস-দ্রব্যের অপেক্ষা করে না ইহা অতীব সত্য কথা। আলাপ ব্যবহারেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বাহিরে জঁাক জমক না থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব ছাই-চাপা আগুনের মত বাহির হইয়া পড়ে ; তাহার জন্য বিজ্ঞাপনের দরকার হয় না। পক্ষান্তরে বাহির চটক্ সত্ত্বেও লঘু জনের লঘুত্ব চাপিয়া রাখা যায় না, উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ঐ বিষয়ে পিতামাতার গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—Habit is the second nature—অভ্যাসই ( মানুষের ) স্বভাব গঠন করে। অনেক সময় পিতামাতার অযথা প্রশ্রয় পাইয়াই হউক অথবা অন্যের অনুকরণেই হউক ছেলেমেয়েরা বাল্যকাল হইতেই বিলাসী হইয়া উঠে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্বভাব অপরিবর্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। যদি পিতামাতা বালক বালিকাদিগকে বিলাসিতা করিতে প্রশ্রয় না দেন, তাহা হইলে তাহাদের ঐরূপ প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে না। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন পিতামাতার ঐ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে সন্তানেরা ভবিষ্যৎ জীবনের একটী গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।



# কৃপণ এবং মিতব্যয়িতে প্রভেদ

অতি সঞ্চয়ী এবং কৃপণ একই কথা। যে অর্থ শুধু সঞ্চয়ের জন্যই উপার্জ্জিত হয় তাহা কু-অর্থ। যে অর্থ মানবের মঙ্গলার্থে নহে তাহা ব্যর্থ। জগতের কল্যান সাধন করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে মনের মধ্যে কৃপণতার প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় না। সেই জন্য পরোপকার প্রবৃত্তির দ্বারা কৃপণতাকে দূরীভূত করিতে হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃপণের সঞ্চিত ধন প্রায়ই পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর অসদ্ব্যয়ে সমস্তই নিঃশেষ হয়। সুতরাং পরিমিত ব্যয় দ্বারা কৃপণস্বভাব লোকদিগের কুপ্রবৃত্তি নষ্ট করা উচিত।

অর্জ্জিত অর্থ সমস্ত সঞ্চয় করাই কৃপণের সুখের বিষয়। কিন্তু ন্যায্য খরচ করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাতেই মিতব্যয়ীর সুখ হয়। কৃপণের নিকট সঞ্চিত অর্থই জীবন-সর্ব্বস্ব কিন্তু মিতব্যয়ীর নিকট উহা নিজের পোষ্যবর্গের এবং অন্যের সুখ শান্তির বাহন মাত্র।

কৃপণের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়; হৃদয়ের যাবতীয় সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। সে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না। এক পক্ষে কৃপণেরা সমাজের শত্রু। তাহারা চিনির বলদের ন্যায় সারা জীবন অর্থের বোঝা বহন করে মাত্র, উহার এক তিলও তাহাদের ভোগে আসে না।

কৃপণদিগের অমানুষিক কঞ্জুষতায় ক্ষুব্ধ হইয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন—'যদি শত অপকার্য্য করিতে হয় তাহাও বরং করিবে, তথাপি পরিজনদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ দিও না। তাহাতে তোমার মহাপাতক হইবে। ইহলোক ত্যাগ করিয়া যখন তুমি পরলোকে যাইবে তখন তোমার কঞ্জুষ আত্মার সদ্গতি হইবে না।' কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য, প্রচুর থাকা সত্ত্বেও যাহারা বঞ্চিত তাহাদের দীনতা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন—

"মিতব্যয়ীর চরম লক্ষ্য পরপোষণ ও পরার্থে আত্মোৎসর্জ্জন, কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। * * কৃপণের আদি চিন্তা আত্মসুখ, মিতব্যয়ীর আদি চিন্তা পরের সুখ, * যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধাতুরকে এক মুষ্টি অন্ন এবং তৃষ্ণাতুরকে এক বিন্দু জল না দিয়া গভীর রাত্রিতে কুশীদ গণনার কষ্টকর চিন্তায় ডুবিয়া রহে— যে মুসলধার বৃষ্টির মধ্যে দ্বারস্থ অতিথিকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়া মনের আনন্দে পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকে এইরূপ পিত্তদগ্ধ লোকেরা বৃথা এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, বৃথা এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। কবি এইরূপ স্বর্ণভার নিপীড়িত সমৃদ্ধ-দরিদ্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন—'তুমি ধনী হইলেও দরিদ্র, গর্দ্দভ যেমন নিপীড়িত পৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত সুবর্ণরাশির ভার বহন করে, তুমিও সেইরূপ ধনের ভার মাত্র বহন করিয়া পথে একটুকু অগ্রসর হইতেছ, এবং

পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমাকে সেই ভার হইতে মুক্ত করিবে।

"যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে এক মুষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা এক মুষ্টি কম খান, পরকে সুখে সম্ভোগে অধিকারী করার অভিলাষে আপনাদিগের সুখ সম্ভোগের চক্র একটু সঙ্কোচ করেন তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক।

"যে জীবনের প্রথম হইতেই মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয় তাহার নিকট স্বজন, স্বদেশ, স্বজাতি, এবং সমাজ কোন প্রত্যাশা করে না। যাঁহারা পূর্ব্বে সঞ্চিত কিম্বা উপার্জ্জিত অর্থরাশি দ্বারা জগতের উপকার করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যদি তাঁহারা অর্থকে এক হাতে উপার্জ্জন করিয়া চৈত্র বায়ুতাড়িত শক্তুর (ছাতু) ন্যায় অপর হস্তে উড়াইয়া ফেলিতেন, অথবা উচ্ছৃঙ্খলতার অবতারের ন্যায় সম্পত্তিকে সেব্য অসেব্য নানাবিধ ভোগ সুখে ভাসাইয়া দিতেন তাহা হইলে অনেক মাক্ষিক প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া মধুর গুণ গুণ করিত, কিন্তু কালাতিপাতে কে তাঁহাদের নাম শুনিত?"

———

# অপব্যয়

অকারণে অর্থ ব্যয় করাই অপব্যয়। আর্থিক উন্নতির সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অপব্যয়ী লোকদিগকে কোন দিন আর্থিক উন্নতি করিতে দেখা যায় না। দূরদৃষ্টিবিহীন অনেক বাঙ্গালী যুবক অভিভাবকের অর্থ অপব্যয় করে। পরিণামে তাহাদের অনেককেই কৃত কর্ম্মের ফলভোগ এবং সে জন্য অনুশোচনা করিতে হয়। আমাদের অধিকাংশ ধনী সন্তানেরা ঐ অপরাধে অপরাধী।

সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে অপব্যয় বলিতে শুধু অর্থের অপব্যয় বুঝায় না; খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যেরই অপচয় হইতে পারে। অনেক পরিবারে অর্থের অপব্যয় অপেক্ষা অন্যান্য জিনিষের অপব্যয় অধিক হইয়া থাকে এবং তাহা অনেক সময় আর্থিক উন্নতির অন্তরায় ঘটায়। অন্যান্য মন্দ মনোবৃত্তির ন্যায় অপব্যয় মনোবৃত্তি দূরীভূত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। যাঁহারা ঐ বিষয়ে উদাসীন তাঁহাদের নিকট আর্থিক উন্নতি সুদূরপরাহত।

ইংরাজীতে এইরূপ প্রবাদ আছে—Waste not, want not.—অর্থাৎ অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। The future hangs on past events.—অর্থাৎ ভবিষ্যতের

ফলাফল অতীতের ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে খরচ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, টাকা, খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ যেন অযথা ব্যয়িত না হয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিষ কিনিলে অর্থের অপব্যয় হয়। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটীস্ তাঁহার দেশবাসীদিগের অপব্যয়ের আতিশয্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন—How many things can I do without—আমি কত কম জিনিষে চালাইতে পারি। অর্থনৈতিক জীবনের এই মহামন্ত্র তিনি নিজে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। কোন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন— It is easier to make money than to know how to spend it.—অর্থোপার্জ্জন করা সহজ বটে, কিন্তু সদ্ব্যয়-প্রণালী জানা শক্ত।

আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতাই অপব্যয়কে প্রশ্রয় দেয় কারণ, আমরা সব সময় মতি স্থির করিতে পারি না। গ্রীক্ পণ্ডিত সিসিরো ( Cicero ) বলিয়াছেন—Not to have a mania for buying is to possess a revenue. Here is something wonderfully cheap ; let us buy it. Have you any use for it ? No, not at present, but it is sure to came useful some

time.' Is it not a bad policy? উহার মর্ম্ম এইরূপ,—কোন অনাবশ্যক জিনিষ অত্যধিক সস্তা হইলেও তাহা ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া ক্রয় করা উচিত নহে। ঐরূপ বাতিক না থাকিলে বিস্তর পয়সা বাঁচে। এক জন ইংরাজ বলিয়াছেন—Many are carried away by the habit of bargaining—buying. Fashion runs in the habit of buying. অর্থাৎ অনেকে সস্তা জিনিষ কিনিতে কিনিতে অপব্যয়ী হইয়া পড়েন। ঐরূপ কিনিবার আভ্যাস হইতে বিলাসিতা জন্মে।

অপর এক জন নীতিজ্ঞ বলিয়াছেন— Buy nothing simply because it is offered cheap. The quetion should be, can I not get along without it? This is the secret of true economy—curtail your needs. He who buyes what he does not need, will often need what he can not buy. One can not be able to purchase all that one may want throughout life. * * Articles going cheap or offered gratis are at first sight things of luxury but through long use become objects of necessity, and then it is difficult to do

without them. অর্থ:—সস্তা বলিয়া কোন অনাবশ্যক জিনিস কেনা উচিত নয়। প্রয়োজন হ্রাস করাই মিতব্যয়িতার মূল সূত্র। অ-দরকারী জিনিষ কিনিতে লাগিলে (অভ্যাস খারাপ হইয়া) ক্রমশঃ বহুবিধ অ-দরকারী জিনিষ কিনিবার বাসনা জন্মে, অথচ সারাজীবন যত কিছু অ-দরকারী জিনিষ কিনিবার ইচ্ছা হয় সেগুলি সব কেনা সম্ভব হয় না। * * অল্প মূল্যের অথবা বিনামূল্যের জিনিষ প্রথমে বিলাস-সামগ্রী হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিক দিন ব্যবহার করিলে উহা আবশ্যক বস্তুতে পরিণত হয়। তখন উহা ত্যাগ করা শক্ত। (ইংরাজ, জাপানী, জার্ম্মাণ বণিকেরা বাজারে বহু অ-দরকারী জিনিষ আমদানী করিয়া বহু লোকের মনে প্রলোভনের সৃষ্টি করে। উহা দেখিবামাত্র তাহাদের অভাব বোধ হইতে থাকে; তখন তাহারা বিবিধ জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়।)

দূরদৃষ্টির অভাবে এবং অপব্যয়জনিত কুফলে বহু লোককে কষ্টে পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু, তাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

শুধু অর্থে নহে, আমাদের বাঙ্গালী সমাজে খাদ্য দ্রব্যাদিরও ও যথেষ্ট অপব্যয় হইয়া থাকে। সাহেবদের ভোজে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা গণনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হিসাব মত খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করা হয়। অপচয়ের অভাবে একটুও

খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সমাজে নিমন্ত্রিত লোকদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্যের দেড় গুণ আয়োজন করিয়াও অনেক সময় অসঙ্কুলন ঘটে। ইহার প্রধান কারণ অপচয়। বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায় নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে খাদ্যের অপচয় করেন না। ইহা প্রশংসনীয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশনের দোষেও অপচয় হইয়া থাকে। যদি হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোক ঐ বিষয়ে যত্নবান হন তাহা হইলে অপচয় বন্ধ হইতে পারে।

খাইতে বসিয়া পাত্রে ভাত ফেলিয়া রাখা আমাদের বাঙ্গালী জীবনের নিত্য ঘটনা। প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারে এই ব্যাপার প্রত্যহ সংঘটিত হয়। ঐরূপে ভাতের অপচয় না হইলে প্রত্যহ প্রত্যেক পরিবারের উচ্ছিন্ন অন্নে দুই একটী নিরন্ন ভিক্ষুকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন জিনিষ, সামান্য, বলিয়া, ফেলিয়া দিতেন না। কেহ তাঁহাকে চিঠি দিলে তিনি তাহার সাদা অংশটুকু তুলিয়া রাখিতেন। কোন মোড়ক আসিলে তাহার সুতাটুকু গুছাইয়া রাখিতেন। তাঁহার দৌহিত্র জ্যোতীশ ইহাতে প্রায়ই হাসিতেন। কিন্তু রাত্রে মশারির দড়ির অভাব হইলে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দাদা মহাশয়ের সঞ্চিত দড়ি লইতে হইত।

## অপব্যয়ের ফল

অপব্যয় করিলে অর্থ সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় করিতে না পারিলে দারিদ্র্য ঘুচে না। দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ, দারিদ্র্য-জনিত তীব্র মর্ম্মপীড়া দরিদ্র ছাড়া কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। বিদ্বান, বুদ্ধিমান কর্ম্মকুশল, চতুর, সচ্চরিত্র, মর্য্যাদাবান ব্যক্তি যদি ভাগ্যদোষে কিংবা নিজ কর্ম্মদোষে দরিদ্র হইয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত গুণ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দারিদ্র্য-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সকলের নিকট তিনি নগণ্য, হেয়, অযোগ্য এবং নির্ব্বোধ বলিয়া বিবেচিত হন।

অপব্যয়ের ফলে মানুষের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে সে বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন—"যাহারা স্বসুখ লালসায় ও ভোগ পিপাসার প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হন তাহাদিগের পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপার দুঃখ সমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। যে সকল সুকোমল প্রকৃতি শিশু এক সময়ে আদরের পুতুল ছিল, পিতার অমিতব্যয়িতায় আজ তাহারা অনাথ-নিবাসের অতিথি অথবা অন্নের জন্য লালায়িত—যাঁহারা এক সময়ে অন্তঃপুরের কমনীয় উদ্যানে কুসুমের মত বিকশিত ছিলেন, পতি কিম্বা

পরিবারস্থ অভিভাবকের অমিতব্যয়িতায় আজি তাঁহারা তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী।"

অপব্যয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল—দারিদ্র্য, তাই কবি বলিয়াছেন,

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে *
* দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী।

অর্থাৎ একমাত্র দারিদ্র্য দোষই মানুষের সমস্ত গুণ নষ্ট করে। ডক্‌টর জন্‌সন্‌ বলিয়াছেন— Poverty takes away so many means of doing good, and produces so much inability to resist evil, that it is by all virtuous means to be avoided. Resolve then not to be poor, whatever you have, spend less. * * No man can help others who wants help himself. We must have enough before we have to spare. অর্থ— দরিদ্রতা পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি এবং অমঙ্গল নিবারণ করিবার শক্তি এত নষ্ট করে যে, সদুপায়ে ও সর্ব্বতোভাবে দরিদ্রতাকে দূর করা উচিত। 'দরিদ্র হইব না' এইরূপ সংকল্প কর। তোমার যাহাই থাকে তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয় কর। যে নিজে সাহায্যপ্রার্থী সে অপরকে সাহায্য করিতে পারে না। ব্যয় করিবার পূর্ব্বে আমরা অবশ্য অবশ্য অধিক সঞ্চয় করিব।

# পরিশিষ্ট

## ঋণ

গৃহস্থের পক্ষে ঋণের ন্যায় মহাশত্রু আর নাই। উত্তমর্ণের, নিকট অধমর্ণের বিদ্যাবুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, সচ্চরিত্র প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য হয় না। সময়ে অসময়ে উত্তমর্ণের রক্তচক্ষু ও অন্ধকার মুখ দেখিলেই অধমর্ণের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়। অনেক সময় উত্তমর্ণ চরিত্রহীন, নীচপ্রবৃত্তি কুটীল, কপট, অভদ্র, হইলেও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অধমর্ণকে তাঁহার নিকট মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হয়। এ বিষয়ে অনেকেই কিছু না কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন, ভুক্তভোগীর ত কথাই নাই। যে মানসিক শান্তি পাইবার জন্য সমগ্র জগতের লোক লালায়িত, ঋণভার মনের সেই শান্তিকে নির্ম্মূল করে। দেয়। মনের তেজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণগুলি ঋণভারে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক লোকের দৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত যে, তিনি কোন দিন ঋণ গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য অবস্থা বিপর্য্যয়ে মানুষকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে অতিশয় প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত। উহা উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। তাহাতে আর্থিক উন্নতির সমূহ বিঘ্ন ঘটে।

পূর্ব্বে লোকদিগের মধ্যে ঋণ পরিশোধ বিষয়ে যেরূপ প্রবল আগ্রহ দেখা যাইত বর্ত্তমানে তেমন দেখা যায় না। উহা অর্থনৈতিক জীবনের মারাত্মক দুর্লক্ষণ। পূর্ব্বেকার লোকদিগের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে আগ্রহাতিশয্যের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে তাঁহারা অধিকতর স্বাধীনতাপ্রিয় এবং তেজস্বী ছিলেন। যাঁহারা ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে উদাসীন তাঁহারা দুর্ব্বলচিত্ত, নিস্তেজ, এবং পুরুষোচিত গুণশূন্য এইরূপ মনে হয়।

## স্বাধীনবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠার পথ

পল্লী অঞ্চলে অধিকাংশ লোক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বী। তাঁহাদিগের মধ্যে চিকিৎসক ও আইনজীবীরাই অগ্রগণ্য। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিযোগিতায় উন্নতি লাভ করিয়া ভাগ্যবান বলিয়া গণ্য হন। পরন্তু বহু ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় অনুত্তীর্ণ হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন।

চিকিৎসকদিগের মধ্যে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ হাকিম প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া রোঝা মাদুলী কবচওয়ালা, ঝাড়ফুঁকওয়ালা ও তান্ত্রিক চিকিৎসকেরও অভাব নাই। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিযেগিত. দেখা দিয়াছে।

অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তিরা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যোগ্যতার অভিমানে অনেকেই নিজের বিদ্যা আদৌ জাহির করিতে চান না। সেই জন্য তাঁহাদের যথোপযুক্ত পসার জমে না। পক্ষান্তরে কেহ কেহ এইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, প্রথমতঃ লোকেরা আকৃষ্ট হইলেও পরে তাহারা বিরক্ত হইয়া উঠে। বাক্যাড়ম্বর বাচালতায় পরিণত হইয়া উল্লিখিত ব্যক্তির গুরুত্ব কমাইয়া দেয়। কাজেই পসার জমে না।

মানুষের সাধারণ প্রকৃতি এইরূপ যে, সে সহজে নিজের ভুল ও দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারে না। অপর কেহ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সংশোধন হইতে পারে। তাহা ছাড়া বহু লোক ব্যবসায়ের এবং ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বুঝিয়া কাজ করিতে পারে না। সুতরাং যে অসঙ্গতি বা গলদের জন্য পসার জমে না, তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া নিজ ব্যবসায়ে অগ্রসর হওয়া উচিত।

ওকালতী, মোক্তারী প্রভৃতি কার্য্যেও উন্নতি অবনতির ধারা চিকিৎসকদিগের অনুরূপ। নিজ নিজ গলদ দূরীভূত করিয়া কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিলে বহু কার্য্যে উন্নতি লাভ করা সহজ হয়। সর্ব্বদা বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। সময় মত ঐ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। অধিক কাল-বিলম্ব হইলে উল্লিখিত ব্যবসায়ে পসার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

## বাঙ্গালীর জাতীয়তা বোধ

অধুনা পৃথিবীর বহু সভ্য দেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি দেখা যাইতেছে। এমন কি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিকতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—'আসাম আসামীর জন্য বিহার বিহারীর জন্য কিন্তু বাঙ্গালার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত।' ঐ বিষয়ে বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবার দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না বাঁচাইলে আর কে বাঁচাইবে? প্রত্যেক বাঙ্গালীকে শপথ করিতে হইবে—যোগ্য বাঙ্গালী পাইতে অন্য কাহাকেও কার্য্যে নিযুক্ত করিব না; বাঙ্গালীর দোকানে মাল থাকিতে অন্য কাহারও জিনিষ কিনিব না; বাঙ্গালীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিব।

## বাঙ্গালীর জ্ঞাতব্য বিষয়

বাঙ্গালার আয়তন ৮২,৯৫৫ বর্গ মাইল। জেলা ২৮টী বাঙ্গালার গ্রাম সংখ্যা—৯১,২০০ জন সংখ্যা—৫,১০,৮৭,৩৩৮ হিন্দু—২,১৫,৭০,৪০৭। মুঃ— ২,৭৪,৯৭,৬২৪ অন্যান্য—২০ ১৯,৩০৭। শিক্ষিত শতকরা ৯.২; অশিক্ষিত শঃ—৯০.৮ জন্ম শঃ ২.৯, মৃত্যু শঃ ২.৩৫। বাঙ্গালীর গড় আয়ু ২৫ বৎসরেরও কম। মাথা পিছু বাঙ্গালীর জমি; ৩/০ বিঘা মাথা পিছু দৈনিক আয় ৭পয়সা মাত্র।

———